# মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার

حسنِ معاشرت

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

# মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৪২

১৩শ প্রকাশ (৩য় সংস্করণ)

| | |
|---|---|
| শাবান | ১৪৩৪ |
| আষাঢ় | ১৪২০ |
| জুন | ২০১৩ |

বিনিময় মূল্য : ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

حسن معاشرت -এর বাংলা অনুবাদ

MATA-PETA-O-SHANTANER ODHIKAR by Allama Yousuf Islahi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 140.00 Only.

# তৃতীয় সংস্করণের কথা

ইসলামী সমাজ বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। এ দায়িত্ব পালন শুরু হয় পারিবারিক জীবন থেকে। পারিবারিক জীবনের কর্ণধার হলেন পিতা। অনেক সময় মাতাও। পরিবার যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে অনাবিল শান্তি অবধারিত। এ সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার যেমন স্বীকৃত তেমনি সন্তানের অধিকারও। মোটকথা, ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার দানের সাথে সাথে কিছু কর্তব্যও নিরূপণ করা হয়েছে। তেমনি সন্তানের অধিকার প্রদানের সাথে সাথে অনেক দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। মাতা-পিতা এবং সন্তান যদি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তাহলে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে উঠে। আর সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে উঠলে ইসলামী সমাজ বিপ্লব তরান্বিত হয়।

ভারতের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং 'আসান ফিকাহ'র লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহীর 'হুসনে মায়াশিরাত' সিরিজে 'মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার' নামক গ্রন্থটিও একটি সুন্দর গ্রন্থ। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে মাতা-পিতার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন, তেমনি সন্তানও অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে যথাযথ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আমাদের ধারণা, বইটি ইসলামী সমাজ বিপ্লবেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বইটি নূতনভাবে সংশোধন ও মেকাফ করে তৃতীয় সংস্করণ বের করা হলো। বইটির অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই শুধরে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আল্লাহ পাক এ নগণ্য চেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ১০ মহররম, ১৪১৫ হিজরী
৭ আষাঢ়, ১৪০১ সাল।
২১ জুন, ১৯৯৪ সন।

বিনয়াবনত

**আবদুল কাদের**

# সূচীপত্র


**আল্লাহর পরে যার হক বড়** ১৫

মাতা-পিতার গুরুত্ব ১৭

**মাতা-পিতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার** ২০

**মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ** ২২

**মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন** ২৫

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহত ২৫

নরম স্বরে আলাপ আলোচনার সওয়াব ২৬

**মাতা-পিতার বদলা** ২৭

মাতার বদলা ২৭

মায়ের সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ ২৭

**মাতা-পিতার আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ** ২৯

**মাতা-পিতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি** ৩২

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ ৩৬

**মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়** ৩৮

**মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার সওয়াব** ৪৩

মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি ৪৩

মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য ৪৪

পুত্রের সম্পদে পিতার অধিকার ৪৫

মাতা-পিতার ঋণের চিন্তা ৪৬

মাতা-পিতার খিদমতের বরকত ৪৬

**মাতার অধিকার পিতার থেকে বেশী** ৪৮

শিক্ষণীয় কথোপকথন ৪৯

মাতার মমতার প্রতি খেয়াল রাখা ৫১

মাতার আদেশের প্রতি খেয়াল রাখা ৫২

মাতার প্রতি আদব প্রদর্শন ৫২

মাতার খিদমত ৫২

মাতার সাথে আচরণ ৫৩

**দুধ মাতার সাথে আচরণ** ৫৫

**অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে আচরণ** ৫৬

হযরত সা'দের কাফের মা ৫৬

মুশরিক মা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নির্দেশ ৫৭
ইসলাম অস্বীকারকারী মা'র সাথে সুন্দর আচরণের ফল ৫৮

**মাতা-পিতার নাফরমানী** ৬১
জঘন্যতম গুনাহ ৬১
ইয়েমেনবাসীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের পত্র ৬৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়ত ৬৪
মাতা-পিতাকে কাঁদানো ৬৪
মাতা-পিতাকে গালমন্দ দেয়া ৬৪
অভিশাপ দেয়া ৬৫
নাফরমানীর শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় ৬৭
নাফরমানের নেক কাজ ফলহীন ৬৭

**মা'র সাথে নাফরমানী** ৬৯
মা'র বদদোয়া ৭৩
মা'র নাফরমানীর শিক্ষণীয় শাস্তি ৭৫

**এক নজরে মাতা-পিতার সাথে ভালো**
**আচরণের ফল** ৭৬

**সন্তানের অধিকার** ৭৯
সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা ৮১
মুসলমান মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য ৮২
মা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা ৮৩
সন্তানদের সম্পর্কে সাধারণ অভিযোগ ৮৪
মাতা-পিতার চিন্তার বিষয় ৮৫
সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ৮৬
সন্তানের অধিকার ৮৮
সন্তানের ৭টি অধিকার ৮৮

**সন্তানের কদর ও মূল্য** ৮৯
জান্নাতে বিশেষ মহল ৯০
সন্তান সাদকায়ে জারীয়াহ ৯১
সন্তান হত্যা জঘন্যতম পাপ ৯২
সন্তান হত্যার কারণসমূহ ৯৩
নিষ্পাপ কন্যার হৃদয়বিদারক ঘটনা ৯৬
শিক্ষণীয় কাহিনী ৯৯
মেয়েদেরকে জীবন্ত দাফন থেকে বাঁচানোর শুভ চেষ্টা ১০০

**কন্যার জন্য** ১০২
কন্যা সৌভাগ্যের কারণ হলো ১০৪

**সন্তান প্রতিপালন** ১০৮
মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহর ইহ্সান ১০৮
সন্তান প্রতিপালন একটি স্বভাবজাত প্রবণতা ১০৯
প্রতিপালন প্রশ্নে মুসলমান মা'র পার্থক্য ১১০
সন্তান প্রতিপালনের অর্থ দুটি দায়িত্ব ১১২
দায়িত্ব বন্টন ১১৩
শিশু প্রতিপালনে মা'র খিদমতই প্রকৃত কৃতিত্ব ১১৩
মহিলাদের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কাজ ১১৫
সন্তানের খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে না করা ১১৬

**সন্তান লালন-পালন ও মহিলা সাহাবী** ১১৮
প্রতিপালনের দায়িত্ব পালনকারিণী একজন মা ১১৮
শিশু প্রতিপালনের জন্য নজিরবিহীন কুরবানী ১২০

**মায়ের দুধ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ** ১২১
মা'র দুধের শরীয়ী ও নৈতিক গুরুত্ব ১২৪
দুধ খাওয়ানোর সীমাহীন মূল্য ১২৬

**চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মাতৃদুগ্ধ** ১২৭
এক মা'র ঘটনা ১২৭
মাতৃদুগ্ধ এবং স্বাস্থ্য ১২৮
আধুনিক গবেষণা ১২৯
মা'র ছাড়া অন্য দুধ খাওয়ানোর কুফল ১৩০
হৃদ্যতা ১৩০

**সন্তান প্রতিপালনের খরচ বহন** ১৩১
খরচ বহনের অর্থ ১৩১
ব্যয়ভার এবং পিতার আবেগ ১৩১
ব্যয়ভার ও দীনি দায়িত্ব ১৩২
উত্তম আদর্শ ১৩৩
আকীকা ১৩৩
খাতনা ১৩৫
দুধ মাতার দুধের বিনিময় ১৩৬

**কুরআনে সন্তানের ব্যয়ভার বহনের নির্দেশ** ১৪০
**হাদীসের আলোকে সন্তানের ব্যয়ভার বহন** ১৪২
প্রাথমিক খরচ সন্তানের জন্যই ১৪২

সন্তানের ব্যয়ভার বহনে অবহেলা কঠিন গুনাহ ১৪৩
যে ব্যয়ের সওয়াব সবচেয়ে বেশী ১৪৪
যে পিতার চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় চমকাবে ১৪৫
সন্তানের জন্য খরচকারিণী মা'র সওয়াব ১৪৬

**কন্যা প্রতিপালন** ১৪৮
কন্যা প্রতিপালনের সৌভাগ্য ১৪৮
যে মা'র জান্নাত ওয়াজেব ১৪৯
কন্যা মাতা-পিতার জান্নাত ১৪৯
অসহায় কন্যার ব্যয়ভার বহন ১৫০

**ঈমান দীপ্ত বিপ্লব** ১৫২
এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য ১৫৩

**সুন্দর আচরণ** ১৫৫
অসদাচরণের ভয়ংকর পরিণাম ১৫৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১৫৬

**কুরআন মজীদে সদাচরণের তাকিদ** ১৫৯
আহনাফ বিন কায়েসের নসিহত ১৬০

**হাদীসে সদাচরণের গুরুত্ব** ১৬১
আচরণে সমতা ১৬১
পুত্র ও কন্যার মধ্যে ভিন্ন ধরনের আচরণ ১৬৩
কন্যা জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক ১৬৫

**সন্তানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ** ১৬৭
কন্যার সাথে ভালো আচরণ ১৬৮

**ভালো নাম রাখা** ১৭১
সন্তানের জন্য পসন্দনীয় নাম ১৭২
ভালো নাম রাখার হেদায়াত ও হিকমত ১৭৩
আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নাম ১৭৪
ভালো নামের শুভ সূচনা ১৭৫
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি কৌতুক ১৭৬
নামের সম্মান প্রদর্শন ১৭৬
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাবিত কতিপয় নাম ১৭৭
নাম পরিবর্তন ১৭৭
খারাপ নামের খারাপ প্রভাব ১৮০

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ নাম ১৮০
সম্বোধককে তার পসন্দনীয় নামে ডাকা ১৮১
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রিয় নাম ১৮১
আদরের সাথে সংক্ষিপ্ত নাম উচ্চারণ ১৮১

**সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা** ১৮৩
মুসলমান মা'র ভালোবাসার পার্থক্য ১৮৩
সন্তান পরীক্ষার মাধ্যম ১৮৪
সন্তানের সাথে রুক্ষ ব্যবহার ১৮৮
সন্তানকে চুম্বন দান আল্লাহর রহমাতের কারণ ১৮৮
সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করা নির্দয়তার নামান্তর ১৯০
শিশুকে কোলে নেয়া ১৯০
সন্তানের প্রতি রাসূলের ভালোবাসা ১৯১
মায়ের মমতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত ১৯৩
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকাঙ্ক্ষা ১৯৪
রাসূলের দরবারে এক মা'র ফরিয়াদ ১৯৫

**সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** ১৯৬
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মায়ের বিশেষ অংশ ১৯৬
মহান মায়ের প্রশিক্ষণে ভাগ্য পরিবর্তন ১৯৭

**সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত** ২০০
ইসলামের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত ২০০
দীনের সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্থান ২০৩
সন্তানের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিদান ২০৫
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে জবাবদিহি ২০৬

**শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শুরুর সময়** ২০৮
কুরআন, দোয়া ও নামায শিক্ষাদান ২০৯
ইসলামী আদব শিক্ষা দান ২১০
পবিত্র কিসসা-কাহিনী শুনানোর ব্যবস্থা করা ২১২
নামাযের তাকিদ ২১২

**সন্তানের বিয়ে** ২১৪
ইসলামের হেদায়াত ২১৪
বিলম্বে বিয়ের খারাপ পরিণাম ২১৪
যোগ্য সম্পর্কের সন্ধান ২১৫
জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি ২১৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ২১৭

# মাতা-পিতার অধিকার

- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
- সন্তুষ্ট চিত্ততা
- আবেগের প্রতি দৃষ্টি
- খিদমত
- সুন্দর আচরণ
- আদব ও সম্মান
- মান্য করা
- দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা
- মোহাব্বত ও রহমত
- আর্থিক সহায়তা
- নাফরমানী হতে দূরে থাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

# আল্লাহর পরে যার হক বড়

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দীনী কর্তব্যও।

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤

"এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন, হে পরওয়ারদিগার ! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো।

যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

কুরআন হাকিমের এ দুটি আয়াত বার বার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কতিপ্রয় জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে ঃ

প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে বরদাশত করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা-পিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু মা-বাপ হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

তৃতীয়ত, মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি রহিত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসি মুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত, আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নীচু রাখা আবশ্যক। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত আনজাম দেয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার।

পঞ্চমত, মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও মজবুর থাকে। তখন মাতা-পিতার কত স্নেহ-ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে মুহাব্বত ও রহমাতের আবেগে অবলীলাক্রমে বার বার দোয়ার জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়াদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।

কুরআনে হাকিমের এ দু আয়াতে যে কথাগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা হাদীসে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।

### মাতা-পিতার গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ابن ماجه، مشكوة

"হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে ? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضَا اللّٰهِ فِىْ رِضَاالْوَالِدِ وَسُخْطُ اللّٰهِ فِى سُخْطِ الْوَالِدِ -

"হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَرَدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ ؟ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ اُمِّ قَال، نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ـ ابن ماجه، نسائ

"হযরত জাহিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন ?

জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।"

"তাঁর পায়ের তলায় বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস তিবরণীতে মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা-পিতা (জীবিত) আছেন ? আমি আরজ করলাম, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, যাও, তাঁদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁদের পায়ের নীচেই বেহেশত রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ، قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে অতপর (তাঁদের খিদমত্ করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

# মাতা-পিতার খিদমতের পার্থিব পুরস্কার

মাতা-পিতার খিদমত এবং অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশত নসীব হয়। এ তো আখেরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা সাচ্চা অন্তরে মাতা-পিতার খিদমত করে এবং অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ পাক এ দুনিয়াতেও তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, একবার তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টিতে ঘিরে ধরলো। আশ্রয়ের জন্য তারা এক গুহায় প্রবেশ করে বসে গেলো। আল্লাহর মহিমা ! পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর ধসে গুহার মুখের উপর এসে পড়লো এবং গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। তিন বন্ধু সাংঘাতিকভাবে ঘাবড়ে গেলো। ঘাবড়ানোর কথাও। পাথর সরানো তাদের সাধ্যের বাইরে ছিলো। সেখানে কোনো মানুষও ছিলো না যে, সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। নিরাশ হয়ে তারা বসে রইলো এবং ধারণা করলো যে, জীবিত দাফন হয়ে গেছি এবং সেই গুহাই তাদের কবর। তাদের মধ্যে একজন বললো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হলে চলবে না। এসো আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আশা করি, আল্লাহ নিজের রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে মুক্তি দেবেন।

তাদের মধ্যে একজন মুসাফির বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিলো। আমি দিনে বকরী চরিয়ে ঘরে ফিরতাম এবং দুধ দুইয়ে সর্বপ্রথম মাতা-পিতাকে পান করাতাম। এরপর নিজের শিশুদেরকে দিতাম। ঘটনাক্রমে আমি একদিন অনেক দূরে চলে গেলাম এবং ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেলো। রাতে যখন আমি ঘরে ফিরলাম তখন মাতা-পিতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো আমি বকরীর দুধ দোহন করলাম এবং এক পেয়ালায় ভরে মাতা-পিতার শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কখন তাঁরা জাগবে এবং আমি তাঁদের সামনে দুধ পেশ করবো। বেশ খানিক রাত হয়ে গেলো। আমার শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতে লাগলো। তারা বারবার আমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ছিলো এবং দুধ দুধ করছিলো। কিন্তু পিতা-মাতার আগে তাদেরকে দুধ পান করানো আমি সহ্য করতে পারলাম না। মাতা-পিতা অভুক্ত শুয়ে থাকবেন আর আমার শিশুরা পেট পুরে আরাম করবে,

এটা হতে পারে না। মোটকথা, সারা রাত আমি তেমনি পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাতা-পিতা ঘুমুতে লাগলেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে সারা রাত কেটে গেলো। হে আল্লাহ ! আমি যদি মাতা-পিতার সাথে এ আচরণ শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তোমার রহমাতের সাহায্যে এ পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও।

একথা বলতেই পাথর গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেলো এবং পরিষ্কারভাবে আকাশ নজরে পড়তে লাগলো। অতপর অন্য মুসাফির দুজনও স্ব স্ব নেক কাজের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করলো এবং আল্লাহ স্বীয় রহমাতের মাধ্যমে গুহার মুখ খুলে দিলেন।

# মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا - قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ، ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ، اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

- بخاری، مسلم

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে নামায সময় মতো পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর ? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"

–বুখারী ও মুসলিম

নামাযের গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে কোনো মুসলমান অনবহিত নন। তারপরও নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের সাথে সাথে প্রিয় নবী আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নেক আমলের তাকিদ দিয়েছেন, দীনে তার কি ধরনের গুরুত্ব হতে পারে। মাতা-পিতা এবং সন্তানের মধ্যে তো সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের মধ্যে নেক আচরণ ও ভালোবাসার সম্পর্ক তো রক্তের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি মুমিন মাতা-পিতাকে ভালোবেসেই থাকে এবং যতদূর সম্ভব মন ও অন্তর দিয়ে তাঁদের খিদমত করে। কিন্তু প্রিয় নবী আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাকিদের অর্থ হলো এ সম্পর্কে শুধু বংশীয় এবং ইহকালের সম্পর্কেই নয়। বরং এটা একটা দীনি ব্যাপারও বটে। আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবীই হলো মাতা-পিতার সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। আল্লাহ ও রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হলো যে, তাঁদের অনুগত থাকা এবং খিদমত করা। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বিভিন্নভাবে খুশী রাখার চেষ্টা করা। কোনো মুসলমান যদি মাতা-পিতার অনুগত না হয় তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও অনুগত হয় না। সে শুধু বংশীয় ও

ইহকালীন অপরাধীই নয়—বরং সে আল্লাহর নিকটও অপরাধী। আল্লাহর নিকট তাকে জবাবদিহিও করতে হবে।

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض : اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ، قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ ؟ قَالَ، نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا حَىٌّ، قَالَ فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ ؟ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ـ مسلم

"হযরত আমর ইবনুল আছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি ? সে বললো, জ্বী হাঁ। বরং আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও ? সে বললো, জ্বী হাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।"–মুসলিম

দীনে হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে ? এ সত্ত্বেও যদি মাতা-পিতা বার্ধক্য, দুর্বলতা অথবা কোনো মাজুরীর কারণে সন্তানের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষী হবে। আর তাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরত ও জিহাদের মতো উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে কাঁদায়ে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের খিদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যাও, মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো।”–আবু দাউদ

তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন ? সে বললো, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাঁদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ।

–মুসলিম, আবু দাউদ

# মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رضـ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ لَّكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ، اَبَوَايَ، قَالَ اَذِنَالَكَ ؟ قَالَ لاَ، قَالَ، اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَاِنْ اَذِنَالَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا ـ ابوداود

"হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, জনৈক ইয়েমেনী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে ? সে বললো, জ্বী হাঁ। আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন ? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের নিকট থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নচেৎ তাঁদের নিকট উপস্থিত থেকে সুন্দর আচরণ করতে থাকো।"

এক ব্যক্তি মাইলের পর মাইল দূর অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসেছিলো। আর এসেছিলোও এমন নেক নিয়ত নিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে দীনের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে। কিন্তু তিনি শুধু এ কারণে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে আসেনি এবং মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজে তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। এ হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করলে অনুভূত হয় যে, দীন মাতা-পিতার প্রতি কি ধরনের শ্রদ্ধাশীল এবং কেমন সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করে।

### হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহত

একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কি হন ? সে বললো, হযরত ! ইনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোনো মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না।—আল আদাবুল মুফরিদ

**নরম স্বরে আলাপ-আলোচনার সওয়াব**

হযরত তাইলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মিয়াছ নিজের এক ঘটনা বর্ণনাকালে বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি কিছু গুনাহর কাজে ফেঁসে যাই। আমার দৃষ্টিতে তা কবিরাহ গুনাহই ছিলো। আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম এবং সুযোগ বুঝে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বলতো কি হয়েছে ? আমি তাঁকে ঠিক ঠিক সব বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তো কবিরাহ গুনাহ নয় ; কবিরাহ গুনাহ তো মাত্র ৯টি। শিরক করা, নাহক কাউকে হত্যা করা, জিহাদ থেকে পিঠ ফিরিয়ে রাখা, শরীফ আওরতের ওপর তোহমত আরোপ করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, মসজিদে কুফরী আলাপ করা, দীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং মাতা-পিতার নাফরমানী করে অথবা অবাধ্য হয়ে তাঁদেরকে কাঁদানো। একথা বলার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা রাখো? আমি বললাম, হযরত কেন চাইবো না। আল্লাহর কসম আমি তাই চাই। হযরত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম ! যদি তুমি মাতার সাথে নরম ও সম্মানের সাথে কথা বলো, তাঁর প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। ব্যাস, কবিরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।

# মাতা-পিতার বদলা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدَهٗ

اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهٗ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهٗ فَيَعْتِقَهٗ ـ مسلم، ترمذى، ابو اود وغيره

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাতা-পিতার স্নেহ, ভালোবাসা, লালন-পালন এবং কষ্ট সহ্যের বদলা যদি সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু হয় তাহলে সে যদি পিতাকে কারোর গোলাম অবস্থায় পায় অথবা মাতাকে বাঁদী হিসেবে পায় তাহলে তাঁদেরকে ক্রয় করে আযাদ করে দেবে।"

### মাতার বদলা

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ইয়েমেনীকে নিজের মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলেন। সে ব্যক্তি কা'বা তাওয়াফ করছিলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।"

আমি তাঁর ইঙ্গিতে চলনেওয়ালা সওয়ারী উট
যখন তাঁর সওয়ারী ভয়ে ভাগে তখন আমি দেইনা ছুট

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, বলুন আমি তো মাতার বদলা দিয়ে দিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মাতার বদলা ! এটা তো তাঁর এক 'আহ!' শব্দেরও বদলা হয়নি।

### মায়ের সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ

একবার মারওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু দিনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি জুল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাতা কিছু দূরে অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। যখনই তিনি বাইরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই প্রথমে এসে মাতার দরজায় দাঁড়াতেন এবং বলতেন, প্রিয় আম্মাজান ! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আম্মাজান ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র ! ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। অতপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আম্মাজান ! শৈশবকালে যেমন আপনি স্নেহ ও মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনি যেন আল্লাহ পাক আপনার উপর রহম করেন। তিনি জবাবে বলতেন, প্রিয় পুত্র ! এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যে ধরনের সুন্দর আচরণ করেছো এবং আরাম দিয়েছো আল্লাহও যেন তোমার প্রতি সে ধরনের রহমাত নাযিল করেন।

অতপর তিনি যখন বাইরে থেকে আসতেন এবং ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তেমনিভাবে মাতাকে সালাম করতেন ও একই কথা বলতেন।

# মাতা-পিতার আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَمْسٰى عَاصِيًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانَ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ ـ مشكوة

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম এবং হেদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা হবে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! যদি মাতা-পিতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।"–মিশকাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দানের জন্য এ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে একজন মুমিনের সামনে এ তাৎপর্য প্রতিভাত হয় যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণও এজন্য যে, আল্লাহ মাতা-পিতার অধিকার বর্ণনা করেছেন এবং তা মেনে চলার ও খিদমতের নির্দেশ দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি এমন কোনো ব্যাপারে অবশ্যই মাতা-পিতার আনুগত্য করবে না যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়।

মাতা-পিতার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সুন্দর আচরণের অর্থ হলো, যদি মাতা-পিতা কঠোর মেজাজের কারণে এমন সব দাবী করতে থাকেন, যা পূরণ করা সন্তানের জন্য কঠিন হয় অথবা সন্তানদের সহ্যের সীমার কথা চিন্তা না করে বেশী বেশী পরিশ্রম করাতে থাকেন অথবা সন্তানদের সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত আর্থিক দাবী করতে থাকেন তাহলেও সন্তানদের উচিত নিজেদের আবেগ কাবুতে রেখে এবং জোর করে তাদের খিদমত ও সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখা।

এ অবস্থায় যদিও সন্তানের উপর আনুগত্য ওয়াযিব নয়। কেননা আল্লাহ্ কারোর উপর সাধ্য বা সামর্থ্যের বেশী বোঝা আরোপ করেন না, তবুও মাতা-পিতার আনুগত্যের এটাই চূড়ান্ত রূপ। সন্তান নিজের সামর্থ্যের বাইরে মাতা-পিতার খিদমতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ও আরাম প্রদানের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করবে।

হ্যাঁ, যদি এমন দাবী করেন যাতে অন্যের অধিকার খর্ব হয়, অথবা তার বিস্বাদপূর্ণ প্রভাব অন্যের উপর আপতিত হয় অথবা আল্লাহর কোনো হুকুমের বিরোধিতা হয় তাহলে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, তারা কারোর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাধা দান করে অথবা নীরেট ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা জিদের বশবর্তী হয়ে কন্যাকে বিনা কারণে এমন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনে বাধ্য করতে চায় যে স্ত্রীর শরীয়তের অধিকার আদায়ে কার্পণ্য করে না। অথবা এ ধরনের স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যে বাধা দেয়। তাহলে এ ধরনের মাতা-পিতার আনুগত্য অবশ্যই ওয়াযিব নয়। কেননা অন্যের অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করা ফরয এবং তা না করা মারাত্মক গুনাহর কাজ। হকদার যদি ক্ষমা করে তাহলেই শুধু আল্লাহ্ এ ধরনের গুনাহ্ মাফ করে থাকেন।

স্বামীর খিদমত ও আনুগত্য অথবা তার সম্পর্ক রাখার প্রশ্নেও একটি জিনিস সামনে রাখতে হবে। তাহলো, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা এবং তাদের সুন্দর সম্পর্ক আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত পসন্দনীয় কাজ। আর ইসলাম যে কোনো মূল্যে এ সম্পর্ক কায়েম রাখার তাকিদ দেয়।

নিসন্দেহে মাতা-পিতার আনুগত্য করা ফরয কিন্তু এ আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এটা কোনো স্বাধীন আনুগত্য নয়। দীনের হেদায়াত, আহ্কাম, দাবী এবং মুসলিহাত থেকে পিছপা হয়ে মাতা-পিতার আনুগত্য

আল্লাহর আনুগত্য নয় বরং এটা আল্লাহর নাফরমানী। এ ধরনের আনুগত্য করে কোনো মুমিন সওয়াবের আশা করতে পারেন না। শাস্তিই তার প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি একজনের আনুগত্য হয় তাহলে জান্নাতের এক দরজা খোলা থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, মাতা-পিতার মধ্যে যদি কেউ ইন্তিকাল করেন এবং এখন আর তার আনুগত্যের ও খিদমতের সুযোগ নেই, তাহলে এ ধরনের সন্তানের জন্য ব্যাস একটি দরজাই খোলা রয়েছে, বরং তার মর্মার্থ হলো, যদি মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজনের আনুগত্য করছে এবং অন্যজনকে অসন্তুষ্ট রেখেছে তাহলে একজনের আনুগত্যের জন্য বেহেশতের দরজা খোলা রয়েছে এবং অন্যের নাফরমানীর জন্য দোযখের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করা হয়েছে তাহলে এ আনুগত্যের বিনিময়ে খোলা দরজা খোলাই থাকবে তা বন্ধ করা হবে না।

হাদীসটিতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ একজনের আনুগত্য করে এবং অন্যজনকে নিজের কাজের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট রাখে তাহলে তা সঠিক নয়। একজনের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে রাখেন। কিন্তু অন্যজনের নাফরমানীর কারণে স্বয়ং জাহান্নামের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একজনের আনুগত্য করে অন্যজনের খিদমত ও আনুগত্য প্রশ্নে নিশ্চিত থাকা কোনো মুমিনের সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। সেতো উভয়ের খিদমত ও আনুগত্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়

# মাতা-পিতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি

সামাজিক জীবনে মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব এবং তাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যে, আপনি তাদের আনুগত্যের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন। তাদের কথা পাশ কাটিয়ে শরীয়াতের দাবী পূরণে সক্ষম হতে পারেন। ইসলামে আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির আনুগত্য আপনি সেই সময়ই করতে পারেন যখন আল্লাহ তাদের আনুগত্য করার অনুমতি দিয়ে থাকেন এবং সেই কাজেই আনুগত্য করতে পারেন যা জায়েয বা বৈধ। আল্লাহর নাফরমানী করে কারোর আনুগত্য করলে আপনি গুনাহগার হবেন এবং আপনার এ আনুগত্য আল্লাহর নাফরমানী হবে। আল্লাহর আনুগত্যে মাতা-পিতার অনুগত থাকা যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম তেমনি আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের আনুগত্য করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

মাতা-পিতার অধিকার প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। এ হাদীস সামাজিক জীবনের এক চরম নাজুক ও গম্ভির মাসায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময় হাদীসটির বাহ্যিক শব্দে লোকজন ভুল ধারণায় নিপতিত হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক ইচ্ছা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন পদক্ষেপ না নেয়া যাতে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসটি হলো ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضـ قَالَ كَانَ تَحْتِي اِمْرَأَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهٗ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا ـ ابو داود، ترمذى، نسائى، ابن ماجه

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমার একজন স্ত্রী ছিলো তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে অপসন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে

বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন এবং তার নিকট সকল ঘটনা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ তালাক দিয়ে দাও।"–আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা

এ হাদীস আপনার নিকট জোরের সাথে এ দাবী করে যে, আপনি মাতা-পিতার পূর্ণ আনুগত্য করতে থাকুন এবং নাফরমানীর ধারণাও অন্তরে স্থান দেবেন না। কিন্তু এ থেকে মাতা-পিতার আনুগত্য শর্ত ও বিঘ্নহীন মনে করাও সঠিক নয়। হাদীসটির বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে মানুষ এ ভুল ধারণায় নিপতিত হয় যে, মাতা-পিতার এ অধিকারও রয়েছে যে, যখন তাঁরা চাইবেন তখনই ছেলেকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দেবেন। তার স্ত্রী যদি নেক ও অনুগত হয় তাহলেও তিনি তালাকের নির্দেশ দেবেন। আর যখন চাইবেন তখন কন্যাকে, স্বামী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিবেন। যদি স্বামী নেককারও হয়। সম্পর্ক ছিন্ন করার শরয়ী কোনো কারণ না থাকলেও মাতা-পিতার নির্দেশেই তা করতে হবে।

এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। এর সাথে শরীয়াতের প্রকৃত কোনো সাযুজ্য নেই এবং শরীয়াতের মৌলিক শিক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো হাদীস বুঝার জন্য এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক ইচ্ছা জানার জন্য প্রয়োজন হলো কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা এবং দীনের সামগ্রিক প্রকৃতির আলোকে তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয় এবং দীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে সাযুজ্য থাকে।

এ ঘটনা দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। যিনি দীনের রূহকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করেছিলেন। যাঁর চক্ষু শরীরি দীনকে চলৎ অবস্থায় দেখেছেন। যিনি দীনের মেযাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। যিনি এ তাৎপর্যও জানতেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক নফল ইবাদাত থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলাম যে কোনো মূল্যে এ সম্পর্ক স্থায়ী রাখার তাকিদ দেয়। আর শুধুমাত্র সে অবস্থাতেই এ পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রদান করে যখন বাস্তবিকই তা অব্যাহত থাকায় বৃহত্তর দীনি ও সামাজিক ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশংকা সৃষ্টি করে। তিনি একথাও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন যে, এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় শুধু সেই শয়তানই খুশী হয় যে শয়তানের উপর

আল্লাহর চিরকালীন অভিসম্পাত রয়েছে। তিনি পুত্র বধুকে ঘৃণা করতেন এবং নিজের পুত্রের সাথে থাকা পসন্দ করতেন না। চিন্তা করুন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো দীন সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি নিজের পুত্র বধুকে কেন পসন্দ করতেন না। একথাও কি চিন্তা করা যায় যে, পুত্র বধুর সাথে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো এবং তিনি কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে পুত্র বধুকে স্বামীর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। অথবা পুত্র বধুর কোনো নাফরমানীর কারণে তাঁর জিদ হয়েছিলো যে, তালাক দেয়া ছাড়া তিনি ক্ষ্যান্ত হবেন না। সাহাবীর তাকওয়া সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কোনো মহিলা কি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে একথা ভাবতে পারে ? সেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি দীনের জন্য নিজের সবকিছু কুরবানী করেছিলেন।

দিনের সূর্যালোকের চেয়ে আরো স্পষ্ট যে, অবশ্যই তার সামনে কোনো বৃহত্তর দীনি লক্ষ্য ছিলো এবং কোনো আখলাকী ও সামাজিক মুসলিহাতের কারণেই তিনি পুত্রের নিকট তালাকের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আবার এজন্যও নয় যে, আমি তোমার পিতা। পিতা হওয়ার মর্যাদায় অকারণেও তোমাকে দিয়ে তালাক দেয়াতে পারি এবং তোমার অপরাধ থাকুক আর না-ই থাকুক বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার অনুগত থাকতে হবে।

অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং একজন নেক্‌কার যুবক ছিলেন। দীন সম্পর্কে তিনিও পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। মন ও অন্তর দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পাবন্দী করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশিক্ষণেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা লালিত হয়েছিলো। মাতা-পিতার অধিকার এবং আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কেউ এ ধারণাও পোষণ করতে পারে না যে, তিনি মাতা-পিতার নাফরমানও হতে পারেন। তাঁর নিকট যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তালাক দাবী করলেন, তখন তার জবাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা বলেননি যে, তুমি আনুগত্য অস্বীকার করে পিতার অবাধ্য হয়ে গেছো। বরং মামলাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পেশ করলেন। আর এ দরবার থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় এ ফরমান জারি করা হয়েছিলো যে, স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা জীবনভর পালন করো। এতে যদি তোমাদের কিছু কষ্টও স্বীকার করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি

সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তালাকের নির্দেশ দিলেন।

আপনি যখন দীনের মেযাজ এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তা করবেন তখন এ উপসংহারেই পৌছবেন যে, হাদীসটির মর্মার্থ তাই। দীনের প্রকৃতিও তাই দাবী করে এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাও একথাই বলে। দীনের সুস্পষ্ট হেদায়াত উপেক্ষা করে শুধুমাত্র হাদীসটির প্রকাশ্য শব্দের কারণে মাতা-পিতাকে কি কোনো বৈধ মুসলিহাত থাকুক বা না থাকুক পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে তালাক দেয়ানোর অধিকার দেয়া যেতে পারে ? অথবা কন্যাকে নির্দেশ দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করানোতে বাধ্য করা যায় ?

মাতা-পিতার আনুগত্য যদি এ ধরনের বাধা-বিঘ্ন মুক্ত হয়, তাহলে শাশুড়ী-পুত্রবধুর ভবিষ্যত টানাপোড়নে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘর ভাংবে এবং হাজার হাজার নিরপরাধ মহিলা ও পুরুষের জীবনের আরাম হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহর শরীয়াত এজন্য নয় যে, তার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ এবং শত্রুতা, ক্রোধ ও ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হবে। মাতা-পিতা যখন চাইবে তখনই তার সাহায্য নিয়ে নিরপরাধ কোনো মহিলাকে স্বামীর ভালোবাসা ও অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে এবং কোনো বেকসুর যুবককে নেক স্ত্রীর প্রেম ও ভালোবাসা থেকে মাহরুম করতে বাধ্য করবে।

সন্তানের নিকট থেকে এ ধরনের আনুগত্যের দাবী এবং তাও আবার যুক্তি বিরোধী। তাহলে তা হবে অত্যন্ত হৃদয়হীনতা ও কঠোর ব্যাপার। আর ইনসাফ তো একথা বলে যে, দীন সন্তানের নিকট থেকে এ ধরনের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহ আলাই এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, মাতা-পিতা যদি পুত্রকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দেয় তাহলে পুত্রের উপর সেই নির্দেশ পালন ওয়াজিব নয়। মশহুর মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ হযরত আজ্জুদ্দিন শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাই বলেছেন, সকল ব্যাপারেই মাতা-পিতার আনুগত্য সন্তানের উপর ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ মাতা-পিতা যা হুকুম করবে অথবা নিষেধ করবে তাই পালন করা পুত্রের জন্য ওয়াজিব নয়।

দীনে মাতা-পিতার আনুগত্য ও শোকর গুজারীর যে গুরুত্ব রয়েছে তাকে কে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ মুয়ামেলায় তাদের আনুগত্য ওয়াজিব। তালাক এবং খোলার মাসয়ালা অত্যন্ত নাজুক প্রকৃতির ও সুদূর প্রসারী ফল বহন করে। তার প্রভাব শুধু তালাকদাতা পুরুষ ও খোলাকারী মহিলার উপরই পড়ে না, বরং তার দুঃসহ প্রভাবে বহু নিরপরাধ মানুষও প্রভাবিত হয়। সারা জীবন তাদেরকে ভোগান্তিতে থাকতে হয়।

এ সমগ্র আলোচনা শুধু সেই অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন মাতা-পিতা কোনো শরয়ীতসম্মত কল্যাণ ও যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া তালাক এবং খোলার জন্য বাধ্য করে থাকেন। আপনি যদি অনুভব করেন যে, মাতা-পিতার নির্দেশ কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষি, জিদ অথবা পার্থিব কারণে নয়, বরং কোনো দীন অথবা সামাজিক কারণে দেয়া হয়েছে তাহলে আপনি কোনোক্রমেই সেই নির্দেশ অমান্য করতে পারেন না। তখন মন-প্রাণ দিয়ে তা পালন আপনার জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আপনার জন্য এটা কখনোই জায়েয নয় যে, আপনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তাঁদের আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবেন এবং নিজের ভালোবাসার ওজর পেশ করবেন। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ ও আনুগত্যের দাবী হলো যে, আপনি নিজের ভালোবাসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দকে কুরবানী করে দেবেন এবং তাঁদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিজের খুশী অনুভব করবেন।

## হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ

আরো একটি হাদীস এ ধারণার সমর্থনে পাওয়া যায়। "এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, আমার পিতা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমাকে স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ ভাই, আমি আপনাকে মাতা-পিতার নাফরমানীও করতে বলি না। আবার একথাও বলি না যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। হ্যাঁ, আপনি যদি চান তাহলে আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে কথা শুনেছি তা বলে দিতে পারি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "পিতা জান্নাতের অতি উত্তম দরজা।" যদি তোমরা চাও তাহলে নিজের জন্য তা সুরক্ষিত করে নাও। আর যদি চাও তাহলে তা উপেক্ষাও করতে পারো।–ইবনে হাব্বান

হাদীসটির একথা চিন্তা করার বিষয়। প্রশ্নকারী এসে পরিষ্কারভাবে বললো যে, আমার পিতা আমাকে তালাকের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে একথা স্পষ্টভাবে বলেননি যে, পিতা যখন বলছেন, তখন দিয়ে দাও তালাক। কেননা তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব। বরং তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে মাতা-পিতার অবাধ্য হতেও বলি না, আবার তোমাকে একথাও বলি না যে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এ ব্যাপারে যদি অবধারিতভাবে আনুগত্য ওয়াজিব হতো তাহলে হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন যে, তালাক দিয়ে দাও এবং মাতা-পিতার আনুগত্য করো। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত হিকমত বা কৌশলের সাথে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান শুনালেন এবং প্রশ্নকারী স্বয়ং যাতে এ ব্যাপারে চিন্তা করে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। অবশ্য মাতা-পিতার উপর যাতে যুলুম না হয় সে ব্যাপারে যেন সে খেয়াল রাখে। কেননা তাদের আনুগত্য জান্নাতের মাধ্যম।

# মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا قَالَ نَعَمْ ، خِصَالٌ اَرْبَعٌ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا ، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِ هِمَا وَاَكْرِمُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِىْ لَارَحِمَ لَكَ اِلاَّ مِنْ قِبْلِهِمَا ـ

"হযরত আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল ! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বী হাঁ। চারটি সুরত রয়েছে-(১) মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার, (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ, (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী ও (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মাতা-পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।"-আল আদাবুল মাফরুজ

মাতা-পিতা শিশু লালন-পালন এবং প্রশিক্ষণের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন এবং দিবা-রাত্রি তত্ত্বাবধান করেন। আসল কথা হলো ঃ আপনি যদি জীবনভরও দাস-দাসীর মতো তাঁদের খিদমত করতে থাকেন, তবুও তাঁদের খিদমতের হক আদায় হতে পারে না। এ কারণেই একজন মুমিন সারা জীবন মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে থাকে। কিন্তু যখন মাতা-পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনো চিন্তা করতে থাকেন যে, হায় আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আর এজন্যেই তিনি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের রূহকে খুশী করার জন্য কোনো পন্থা কামনা করেন। এ ধরনের মুমিনের প্রাণের আবেগ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, ওফাতের পরও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা যায় এবং এ আচরণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করে দেন।

**এক ঃ দোয়া ও ইসতিগফার ঃ** নামাযের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ ! আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন। তাঁদের গুনাহসমূহকে ঢেকে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহ-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ ! যখন আমরা তাঁদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। দিনে আয়েশ এবং রাতের আরাম আমাদের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পরওয়াদিগার ! এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমাত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। পরওয়ারদিগার ! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান করো এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দাও।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো ? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বিষয় এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম, ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়, তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই একজন মশহুর বুজর্গ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক রাতে আমরা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে পরওয়ারদিগার ! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার ! আবু হুরাইরার মাতাকে ক্ষমা করো এবং হে পরওয়ারদিগার! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আবু হুরাইরাহ এবং তার মাতার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ায় শামিল থাকি।

**দুই ঃ মাতা-পিতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা ঃ** মাতা-পিতা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিছু ওসিয়ত করতে পারেন।

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তাঁদের জায়েয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসিয়তও পূরণ করা হয় তাহলে এটা তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে না বরং খারাপ আচরণ হবে।

মাতা-পিতা যদি কারোর সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোনো মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন অথবা ওসিয়াত করার সুযোগ পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়াত করতেন অথবা তিনি কোনো ওসিয়ত করেননি। আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাদকাহ্ করেন তাহলে এসবই তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তাঁদের ওফাতের পরও আপনি জীবনভর তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে ? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়।

এ হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুই বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ওফাত পেয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

**তিন ঃ মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে আচরণ ঃ** মাতা-পিতার ওফাতের পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বুজর্গ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

**সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমল**

একবার হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। এ সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে ? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত ! শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে হাজির হয়েছি। কেননা শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো।

o হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক বুদ্দুর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। বুদ্দু হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র ? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন, জ্বী হাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের গাধার উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে বললাম, হে হযরত ! সে তো একজন বুদ্দু অথবা গ্রামবাসী। আপনি যদি দু দেরহাম দিয়ে দিতেন তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ভাই তাঁর পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো ও এ সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। নচেত আল্লাহ তাআলা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

০ হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি যখন মদীনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ ! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান ? আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হযরত! আমি তো তা জানি না। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই ! আমার পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।–ইবনে হাব্বান

**চার ঃ মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ ঃ** মাতা-পিতার ওফাতের পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করা। মাতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন খালা, মামু, নানী, নানা প্রভৃতি এবং পিতামহের পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয় থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন থাকার নামান্তর এবং একজন মুমিন ও মুমিনা মাতা-পিতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করতে পারে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ হলো, তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও বেপরোয়ামূলক আচরণ করবে না। মাতা-পিতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল।

# মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার সওয়াব

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْلَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا ـ

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন মাতা-পিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তেকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমাতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।"

আজীবন মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কিন্তু সামগ্রিক প্রচেষ্টার পরও যদি তাঁরা সন্তুষ্ট না হন এবং অসন্তুষ্ট অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তাহলেও আল্লাহর রহমাতের দরজা খোলা থাকে ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব। অব্যাহতভাবে তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক ভুল ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে আশা করা যায় ও আপনাকে উত্তম বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত করতে পারেন। আল্লাহর রহমত থেকে কোনো মুমিন বান্দারই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বান্দাহর অন্তরে যখনই তাওবার আবেগ সৃষ্টি হয় তখনই তিনি অগ্রসর হয়ে তা কবুল করে নেন এবং সেই আবেগকে অগ্রসর করানো ও জীবনের উপর তার প্রভাব ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন কিন্তু এ হাদীস থেকে ভুল ধারণা নেয়া অবশ্যই ঠিক নয় যে, মাতা-পিতা জীতি থাকা অবস্থায় অবাধ্য থেকে তাঁদের মৃত্যুর পর দোয়া এবং ইসতিগফার করে আল্লাহর রহমাত লাভ করা যাবে। সঠিক কথা হলো, জীবিতাবস্থায় তাঁদের খিদমত এবং সন্তুষ্ট রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা।

## মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ

بَارٍ يَنْظُرُ اِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حِجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا اِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ ـ مسلم

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে সুসন্তানই মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বদলায় আল্লাহ তাকে এক হজ্জ কবুলের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমাত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে। তিনি বললেন, জ্বী হাঁ যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। আল্লাহ (তোমাদের ধারণায়) অনেক বড় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র।"

মর্মার্থ হলো আল্লাহর রহমাত এবং ব্যাপকতা এতো বড়ো যে, তিনি তা থেকেও বেশী প্রদান করতে পারেন। যদি কোনো সন্তান দিন ভর শতবার মাতা-পিতার প্রতি রহমাত ও মুহাব্বাতের দৃষ্টিতে দেখে তাহলে আল্লাহ শত হজ্জের সওয়াবও দিতে পারেন। মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে যাকিছু চিন্তা করতে পারে তিনি তা থেকেও বেশী বড়ো এবং মর্যাদাবান।

মানুষ নিজের সামর্থ্যকে সামনে রেখে চিন্তা করে থাকে। ফলে এতো বড়ো সওয়াব প্রাপ্তি অসম্ভব বলে মনে হয় এবং ভুল ধারণার শিকার হয়। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ সঠিক নয়। তিনি প্রত্যেক ভুল ধারণা থেকে পবিত্র। সেই দয়াশীল সত্তা এতো দান করতে পারেন যে, মানুষের ধারণা সে পর্যন্ত পৌঁছতেই সক্ষম নয়।

## মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ـ

"লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করবো। জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ করো তার প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫

কুরআন ও সুন্নাতে যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মাতা-পিতার উপর খরচ না করে ধন-সম্পদ বাঁচানো সঠিক নয় বলেও তাকিদ দেয়া হয়েছে। বরং সর্বপ্রথম তাদের উপরই খরচ করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্ত হন

তাহলে জবরদস্তি করেই নিতে পারেন। যদি কেউ মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনে কমতি না করেও অর্থ খরচ করতে না চায়, তাহলে সেটাও ঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের উপর তাদের অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদের উপরও তাঁদের অধিকার আছে।

## পুত্রের সম্পদে পিতার অধিকার

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো ইচ্ছা হলেই সে আমার সম্পদ নিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির পিতাকে ডাকলেন। লাঠির উপর ভর দিয়ে এক দুর্বল বৃদ্ধ এসে হাজির হলো। তিনি বৃদ্ধকে সব জিজ্ঞেস শুরু করলে সে বললো ঃ আল্লাহর রাসূল ! এক যুগ ছিলো যখন এ দুর্বল আরো অসহায় ছিলো এবং আমি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম। আমি বিত্তশালী ছিলাম। আর সে ছিলো কপর্দক শূন্য। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নেয়ায় বাধা দিইনি। আজ আমি দুর্বল। সে সুঠাম ও শক্তিশালী। আমি কপর্দক শূন্য। সে বিত্তশালি। এখন সে নিজের সম্পদ আমাকে দেয় না।

একথা শুনে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে দিলেন এবং বললেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।"

## মাতা-পিতার ঋণের চিন্তা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মাতা-পিতার খিদমত এবং অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা করেননি। জীবিতাবস্থায় যেমন খেয়াল রাখতেন তেমনি মৃত্যুর পরও তিনি মাতা-পিতার অধিকারের প্রতি পুরোপুরিই দৃষ্টি রেখেছিলেন। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণত যখন কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তখন মৃত্যুর পর পরই তার উত্তরাধিকাররা নিজেদের অংশের চিন্তায় পড়ে যায়। কিন্তু সাধারণ দুনিয়াদারদের মতো তিনি নিজের অংশের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তাগ্রস্ত হননি। অথচ মিরাছ সূত্রে তাঁর প্রাপ্য ছিলো কোটি কোটি পরিমাণের। অবশ্য তাঁর চিন্তা একটিই ছিলো যে, পিতা কারোর নিকট ঋণগ্রস্ত রয়ে যাননি তো ? বস্তুত তিনি সর্বপ্রথম রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। ঋণ পরিশোধের পর অন্যান্য উত্তরাধিকাররা মিরাছ বন্টনের

তাগাদা প্রদান এবং দাবী উত্থাপন শুরু করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ মিরাছ বন্টনে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, চার বছর অব্যাহতভাবে হজ্জের মওসুমে পিতার ঋণের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিতে থাকবেন। যদি কোনো পাওনাদার থাকে তাহলে সে তা আদায় করে দেবে। কোনো পাওনাদার থাকতেও তো পারে ! চার বছর এভাবে ঘোষণা দানের পর তিনি মিরাছ বন্টন করবেন।

এভাবে তিনি অন্যান্যদেরকে মিরাছ বন্টনে চার বছর বিলম্ব করার প্রশ্নে সম্মত করিয়ে নিলেন এবং হজ্জের মওসুমে ঘোষণা দিয়ে পিতার জন্য হাজার হাজার মানুষ দিয়ে দোয়া ও মাগফিরাত করিয়ে নিতে থাকেন।

## মাতা-পিতার খিদমতের বরকত

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهٖ وَيُزَادُ لَهُ فِيْ رِزْقِهٖ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رِحْمَهُ ـ احمد، الترهيب والترغيب

"হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হায়াত দারাজ এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।"

এ বিশ্ব কর্মক্ষেত্র। পরকালীন জীবনকে সফল করার জন্য বেশী বেশী কামাই করার অবকাশ এখানে মানুষের রয়েছে। পিতা-মাতার খিদমতের বিনিময়ে দীর্ঘ জীবন লাভ এবং সচ্ছলতা আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। মানুষ যাতে আরো কিছু ভালো কাজ করে নেকী বৃদ্ধি এবং মাতা-পিতার খিদমত করে আল্লাহর রহমাতের হকদার হয় তারই সুযোগ এ দুনিয়ায় করে দেয়া হয়েছে।

عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهُ زَادَ اللّٰهُ فِيْ عُمُرِهٖ ـ(الترغيب والترهيب ج ٣)

"হযরত মুয়াজ বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-

পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ্ পাক তার হায়াত দারাজ করবেন।"

দীর্ঘায়ু লাভ একজন মুমিনের জন্য এ অর্থে সুসংবাদ যে, সে পরকালীন জীবনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে আরো পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করার সুযোগ পেলো।

# মাতার অধিকার পিতার থেকে বেশী

সন্তান লালন-পালনে মাতা-পিতা উভয়েরই অংশ থাকে। উভয়েই নিজের আরাম-আয়েশ কুরবানী করে সন্তান প্রতিপালন করেন। পিতা শরীরের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করেন এবং মাতা কলিজার রক্ত পান করিয়ে করিয়ে তাকে পালেন। উভয়ের সম্মিলিত ভালোবাসা, চেষ্টা ও মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। এজন্যেই কুরআন ও সুন্নাহতে উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণের তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং উভয়কেই খিদমত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে বেশী কষ্ট স্বীকার করে থাকেন মা। নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে মা শিশুকে পালন করেন। যে মমতা ও স্নেহে নিজের কলিজার খুন পান করান এবং শিশুর জন্য দিনের আরাম ও রাতের ঘুম অব্যাহতভাবে কুরবানী করেন সেই খিদমত ও কুরবানীর উদাহরণ নেই। এজন্য পবিত্র কুরআনে মাতা-পিতা উভয়ের সাথে সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের কষ্টের চিত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই সাথে এ তাৎপর্যের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, জীবন উৎসর্গকারিনী মা পিতার তুলনায় খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের বেশী হকদার। এ তাৎপর্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط - الاحقاف : ١٥

"এবং আমরা মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করেই ভূমিষ্ট করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজ) মুদ্দত হলো আড়াই বছর।"

–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

অন্য আরো এক স্থানে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাকিদ দিয়ে আল কুরআনে করীমে মাতার সেই নজীর বিহীন কুরবানী ও কষ্টের উল্লেখ করে সন্তানকে মায়ের শোকরগুজারীর উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط ـ لقمن : ١٤

"এবং আমরা মানুষকে, যাকে তার তা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে পেটে ধারণ করেছিলো (অতপর তাকে দুধ পান করিয়েছিলো) অতপর তাকে দু বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। এ তাকিদ করা হয়েছে যে, আমার শোকর আদায় করো এবং মাতা-পিতার।"-সূরা লুকমান ঃ ১৪

পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনা ভঙ্গিতে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, মাতা খিদমত, মুহাব্বাত, আনুগত্য, সুন্দর আচরণ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার বেশী অধিকারী। কেননা, সে জন্মদান ও প্রতিপালনে অসামান্য কষ্ট স্বীকার করে থাকে। নিসন্দেহে লালন-পালনে পিতারও অংশ রয়েছে। কিন্তু পিতার পরিশ্রম এবং কুরবানীর সাথে মাতার ত্যাগ স্বীকারের কোনো তুলনাই হয় না।

## শিক্ষণীয় কথোপকথন

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেযাজের মানুষ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ন মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখনতো সে খারাপ মেযাজের ছিলো না।"

সেই ব্যক্তি বললো, "হযরত! আমি সত্য বলছি সে খারাপ মেযাজের।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমার খাতিরে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো, সে সময়তো সে খারাপ মেযাজের ছিলো না।"

সেই ব্যক্তি বললো ঃ "আমি আমার মাতার সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছ ?"

সে বললো ঃ "আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে তাঁকে হজ্জ করিয়েছি।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন ঃ "তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা বা প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছে ?"

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى، قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ! قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ! اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ ـ

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশী হকদার কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতপর কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতপর কে ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার মা। সে বললো, অতপর কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"

এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, সুন্দর আচরণ, খিদমত এবং আনুগত্য প্রাপ্তির দিক থেকে মাতার মর্যাদা পিতার থেকে বেশী। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ একই জবাব দিতে থাকলেন যে, তোমাদের মাতাই তোমাদের সুন্দর আচরণ প্রাপ্তির বেশী যোগ্য। চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমাদের নেক আচরণের যোগ্য তোমাদের পিতা। হযরত ইবনে বাত্তাল অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন, খিদমত ও আচরণে মাতার হক পিতার থেকে তিন গুণ বেশী। কেননা শিশুর ক্ষেত্রে মাতা এমন তিনটি কাজ আনজাম দেন যা কোনো পিতার পক্ষে চিন্তা করাও দুষ্কর। গর্ভাবস্থায় মাতা শিশুকে পেটে ধারণ করে নিয়ে বেড়ায়। অতপর জন্মদানের কষ্ট স্বীকার করেন এবং নিজের দুধ পান করান। পবিত্র কুরআনেও তাঁর এ তিন গুরুত্বপূর্ণ খিদমত ও কষ্টের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করানো হয়েছে। অতপর প্রশিক্ষণ ও লালন পালনে মাতা-পিতা উভয়েই সমান সমান। এজন্য উভয়ের সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ এবং হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুজনের সাথেই আদব, তাজিম, খিদমত, আনুগত্য ও বিনয়মূলক আচরণ করতে হবে। জমহুর উলামা বা অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মাতার হক পিতার চেয়ে বেশী। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সর্বসময় মাতার খিদমত এবং আনুগত্য এবং পিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতে হবে না। আদব শিষ্টাচার প্রশ্নে পিতাই বেশী হকদার এবং পিতার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সঠিক নয়। উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণের তাকিদ দেয়া হয়েছে। অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে একথা স্মরণ

রাখতে হবে যে, মাতার দুর্বল প্রকৃতিই বেশী ইহসানের দাবীদার। আর এ ইহসানের দাবীই হলো মাতাকে বেশী বেশী আরামের ব্যবস্থা করা। মাতার আনুগত্যে কখনো কমতি করা যাবে না। তার মমতাভরা অন্তরে কখনো দুঃখ দেয়া যাবে না। মাতা যেমন সন্তানের শৈশবকালে সব ধরনের আবেগের প্রতি খেয়াল রাখেন তেমনি কোনো সময়ই তাঁর আবেগের অমর্যাদা করা যাবে না।

## মাতার মমতার প্রতি খেয়াল রাখা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একজন সাহাবী কোনো কথার কারণে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং শিশু সন্তানকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চাইলেন। মায়ের অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো নাজুক। একদিকে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, অন্যদিকে কলিজার টুকরা এবং দুশ্চিন্তা হরণকারী সন্তানও ছিনিয়ে নেয়ার মতো অবস্থা। দুঃখ ভারাক্রান্ত ও পেরেশান মনে সে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলো এবং নিজের সমগ্র দুঃখপূর্ণ কাহিনী অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করলো। সে বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছেন। এভাবে আমি তার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হে আল্লাহর রাসূল! এখন তিনি আমার নিকট থেকে এ শিশু সন্তানও ছিনিয়ে নিতে চান। হে আল্লাহর রাসূল ! হে রহমতে আলম ! এটা আমার আদরের সন্তান। আমার গর্ভ তার আরামস্থল। আমার বুকের ছাতি তার পানের মশক এবং আমার কোল তার ঘরসদৃশ। সে আমার আরামের আধার। সে আমার জন্য কূপ থেকে পানি আনে। হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এ দুঃখ কি করে বরদাশত করবো।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লটারী করে নাও। পিতা অগ্রসর হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! এটাতো আমার বাচ্চা। আমার সন্তানের দাবীদার আর কে হতে পারে ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললেন, ইনি তোমার পিতা এবং ইনি তোমার মাতা। বেটা ! যাকে ইচ্ছা তার হাত ধর। ছেলেটা মায়ের হাত ধরলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেটির মাকে বললেন, যাও। যতদিন তোমার দ্বিতীয় বিয়ে না হবে ততদিন কেউ তাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

## মাতার আদেশের প্রতি খেয়াল রাখা

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে খেজুরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিলো। একদিন মানুষজন দেখলো যে, হযরত উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খেজুরের গাছ কেটে মাথি বের করছেন। এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ হযরত ! এ আক্রার বাজারে আপনি এভাবে খেজুরের গাছটি নষ্ট করছেন। আজকালতো খেজুরের গাছ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তিনি বললেন, "ভাইসব! তোমাদেরকে কি বলবো। আমার মা আমাকে খেজুর গাছের মাথি নেয়ার আদেশ করেছেন। মায়ের আদেশ কি কখনো অবজ্ঞা করা যায় ?"

## মাতার প্রতি আদব প্রদর্শন

হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই একজন মশহুর তাবেয়ী। তাঁকে ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মাতা হিজাজের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাতার আদব ও সম্মান এবং ইচ্ছার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনতেন তখন নরম ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। ঈদের জন্য নিজের হাতে মায়ের কাপড় রং করতেন। মায়ের প্রতি এতো ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের সামনে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেন কোনো গোপন কথা বলছেন।

## মাতার খিদমত

হযরত ওয়ায়েস কুরনী রাহমাতুল্লাহ আলাই অত্যন্ত মশহুর বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁকে উত্তম তাবেয়ী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, "উত্তম তাবেয়ীন কুরন গোত্রের একজন মানুষ। তার নাম ওয়ায়েস। তার একজন বৃদ্ধা মা আছেন। যখন সে কসম খায় তখন তা পূরণ করে। যদি তাঁর কাছ থেকে মাগফিরাতের দোয়া নিতে পার তাহলে অবশ্যই নেবে।"

হযরত ওয়ায়েস রাহমাতুল্লাহ আলাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেরই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার সাথে তিনি মুলাকাত করতে পারেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার বা দর্শন লাভ থেকে নিজের চক্ষুকে আলোকিত করার চেয়ে একজন মুমিনের বড় বাসনা আর কি হতে পারে ! কিন্তু বৃদ্ধা মাতা থাকা এবং তাঁকে একাকী রেখে না

যাওয়ার ইচ্ছার কারণে হযরত ওয়ায়েস রাহমাতুল্লাহ আলাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হতে পারেননি। তিনি দিন-রাত তাঁর খিদমতেই লেগে থাকতেন। হজ্জ আদায়ের বড় সাধ ছিলো। কিন্তু যতদিন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁকে একাকী রেখে হজ্জ আদায় করতে যেতে পারেননি। তাঁর ওফাতের পরই তিনি এ সাধ পূরণ করেন।

## মাতার সাথে আচরণ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, "হযরত ! আমি একস্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কনে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে সে তা গ্রহণ করে। এটা মর্যাদা হানিকর ব্যাপার মনে করে এবং আবেগ তাড়িত হয়ে আমি সেই মাহিলাকে হত্যা করি। হযরত ! বলুন, এখনো কি আমার জন্য তাওবার কোনো পথ আছে ? হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তোমার মা কি জীবিত আছেন ?" সে বললো, "হযরত ! মা তো ইন্তেকাল করেছেন।" তিনি বললেন, "যাও, সত্য অন্তরে তাওবা করো এবং এমন কাজ করো যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো।"

হযরত যায়েদ বিন আসলাম হযরত আবদুল্লাহর নিকট এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই ব্যক্তির নিকট তার মা জীবিত আছেন কিনা—একথা কেন জিজ্ঞেস করেছেন ? হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাতার সাথে সুন্দর আচরণের চেয়ে বড়ো আমল আমার জানা নেই।

এ ধরনের একটি ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই ঘটেছিলো। এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি একটি বড় গুনাহ করে বসেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তাওবার কি কোনো পথ খোলা আছে ? রহমাতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমার মাতা কি জীবিত আছেন ?" সে ব্যক্তি বললো, হুজুর! মাতা তো জীবিত নেই। অতপর তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার খালা কি বেঁচে আছেন ? সে বললো, জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো।"

এসব ঘটনা থেকে মাতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিদমতের দীনি গুরুত্বের আন্দাজ করা যায়। মানুষ যদি বড়ো গুনাহও করে তাহলে তার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে মাতার সাথে সুন্দর আচরণের কথা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আর এটা আল্লাহর চূড়ান্ত রহমাত যে, মা যদি ইন্তেকাল করে থাকেন তাহলে মায়ের বোনের সাথে সুন্দর আচরণ করে মানুষ নিজের পরকাল তৈরী করতে পারে।

# দুধ মাতার সাথে আচরণ

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ رضـ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ ؟ قَالُوْا : هِىَ اُمُّهُ الَّتِى اَرْضَعَتْهُ ـ(ابو داود)

"হযরত আবিত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি জিয়রানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোশত ভাগ করতে দেখলাম। ইত্যবসরে একজন মহিলা এলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পূর্ণ নিকটে চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি তার উপর বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটি কে ? তারা বললেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

আপন মা ছাড়া শিশু যে মায়ের দুধ পান করে তাকে দুধ মা বলা হয়। শুধু দুধ পান করানোর জন্য কোনো মহিলা আপন মা হতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে সেই মর্যাদাই লাভ করেন যা আপন মা পান। বিয়ে এবং পর্দার ব্যাপারে ইসলাম আপন মা'র যে মর্যাদা দিয়েছে দুধ মা'রও সেই একই মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ঘটনাতেও এটা স্পষ্ট যে, দুধ মা'র সাথে আপন মায়ের মতোই আচরণ করতে হবে। তার খিদমত ও সব ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

# অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে আচরণ

এ দুনিয়ায় অবিরাম গতিতে হক ও বাতিলের এবং ন্যায়-অন্যায়ের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। কম হলেও এটা সম্ভব যে, কোনো মুসলমানের মাতা-পিতা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। এ অবস্থায় তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা যাবে ? এটা সামজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

দীন এবং ঈমানের প্রশ্নে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা যদি শিরক ও গুনাহর নির্দেশ দেন তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না। আল্লাহর হক মাতা-পিতার চেয়ে বেশী এবং মাতা-পিতারও উচিত আল্লাহর হক আদায় এবং তার আনুগত্য করা। কেননা তাদের স্রষ্টা ও মালিকের নাফরমানী করে মাতা-পিতার আনুগত্য করা তো দূরে থাকুক এ ধরনের চিন্তা করাও জায়েয নয়।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط ـ لقمن : ١٥

"যদি মাতা-পিতা তোমাদের উপর আমার সাথে কাউকে অংশীদার বানানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে–যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই–তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না।"-সূরা লুকমান ঃ ১৫

শুধুমাত্র শিরকের ব্যাপারেই নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী আবশ্যিক হয়ে উঠে সেসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য নিঃশেষ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর নাফরমানী করে কারোর আনুগত্য করা যাবে না।

### হযরত সা'দের কাফের মা

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ওয়াক্কাস একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর মা এ খবর পেলো। খবর পেয়েই কসম খেয়ে বসলো। হয় ইসলাম ছাড় না হয় অভুক্ত থেকে জীবন দিয়ে দিবো। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু মা'র অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। মা তাঁকে বার বার বলতে লাগলো, দেখো ! তোমাদের দীনে তো মাতা-পিতার আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তোমার মা। মা'র কথা অমান্য করে তুমি স্বয়ং নিজের দীনের খেলাফ করছো। আমি তোমাকে ইসলাম পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি। হযরত সা'দ নিজে বর্ণনা করেছেন যে, তিন দিন পর্যন্ত

তিনি কিছু খাননি এবং পানও করেননি। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে বেহুঁশ হয়ে যান। আমার ভাই জোর-জবরদস্তি করে তার মুখে ধরে হা করিয়ে খাওয়ান। এ অবস্থায় আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

"মাতা-পিতা যদি তোমাদেরকে শিরকের ব্যাপারে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনো না।"

দীন ও ঈমান প্রশ্নে ব্যাপারটি তো স্পষ্ট। সিদ্ধান্তমূলকভাবে তাদের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে এবং তাদের কঠোরতা ও চাপে মোটেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না। কিন্তু পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ করতে হবে। নরম আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে ঈমানের দিকে আনয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج ـ لقمن : ١٥

"এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকো এবং আনুগত্য তাদের করো যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"–সূরা লুকমান ঃ ১৫

ইসলাম মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্যের চরম গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি মাতা-পিতা যদি কুফর ও শিরকের পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকে। শুধু নিজেই নয় বরং সন্তানদেরকেও তাতে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে চায় তবুও সন্তানের জন্য প্রয়োজন হলো পার্থিব বিষয়াদিতে তার মর্যাদা কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না। যাই হোক, তাঁরা মাতা-পিতা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যম। এজন্য সকল কিছু সত্ত্বেও সব ধরনের খিদমত এবং সুন্দর আচরণ তাঁদের সাথে করা ফরয। প্রয়োজন হলে তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্যও দিতে হবে এবং পার্থিব দিক থেকে কোনো অভিযোগের সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া যাবে না। অবশ্য দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, ইসলামের পথে রয়েছেন এবং আল্লাহর সত্যিকার অনুগত নেক্কার বান্দাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে।

## মুশরিক মা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رضـ قَالَتْ ! قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ ، وَهِىَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّىْ ؟ قَالَ : نَعَمْ صِلِىْ أُمَّكَ - بخارى

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুহিতা হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে আমার মাতা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করলাম, আমার মা এসেছেন। অথচ তিনি ইসলামের উপর বেজার। আমি কি তার সাথে আত্মীয়তাজনিত ব্যবহার করতে পারি ? তিনি বললেন, হাঁ। নিজের মা'র সাথে আত্মীয়তাজনতি ব্যবহার করতে পারো।"–বুখারী

এ হাদীসটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুশরিক মাতা-পিতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যেমন মুসলিম মাতা-পিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতা-পিতার প্রতি সবচেয়ে বড়ো শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং খিদমতের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হেদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট দোয়া করা। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মাও প্রথমে ইসলাম থেকে মাহরুম ছিলেন। কিন্তু তিনি তার মান-সম্মান প্রদর্শন এবং খিদমতে কোনো কমতি করেননি। সবসময় তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকেন এবং ইসলামের দাওয়াতও দিতে থাকেন। সবসময় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন হেদায়াত প্রাপ্তা হন। তার এ ঘটনায় স্পষ্টভাবে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ না করুন কারো মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হন, তাহলে তাঁদের সাথে কিভাবে থাকবেন, কিভাবে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে, কিভাবে তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাঁদের শুভ কামনা কিভাবে পূরণ করা যাবে।

**ইসলাম অস্বীকারকারী মা'র সাথে সুন্দর আচরণের ফল**

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হবার পর দীর্ঘদিন যাবত তাঁর আম্মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি অব্যাহতভাবে তাঁকে

শিরকের পরিণাম এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু তখন পর্যন্ত তাঁর অন্তর হিদায়াত গ্রহণের জন্য খোলেনি, এজন্য তিনি অস্বীকৃতিও অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সত্ত্বেও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইজ্জত, খিদমত ও আনুগত্যে কমতি করেননি। একদিন যখন তিনি দীনের দাওয়াত পেশ করছিলেন তখন তাঁর আম্মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অন্যায় আচরণ করলো। এতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি সবসময় আমার আম্মাকে দীনের কথা বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু সে সবসময়ই তা অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু আজ তো গজবই হয়ে গেছে। আজ আমি যখন তার সামনে দীনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলাম তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবিই করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ দিয়ে ফেলেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আমার অন্তর বেদনা বিধূর হয়ে এলো এবং আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমার আম্মার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন।" রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাত দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ ! আবু হুরাইরারর আম্মাকে হেদায়াত দিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোয়া করতে দেখে আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর হতে থাকলো এবং আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ এবং পানি পড়ার শব্দ আসছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে শ্রদ্ধেয় আম্মা বললেন, পুত্র! বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। বাইরেই আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। পানি পড়ার শব্দ শুনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, আম্মাজান গোসল করছেন। আমার অন্তর তখন আনন্দে আত্মহারা ! আম্মাজান তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে কাপড় পরে এসে দরজা খুলে দিলেন। তিনি এতো তাড়াতাড়ি করেছিলেন যে, দোপাট্টা ব্যবহার করতেও ভুলে গিয়েছিলেন এবং দরজা খুলেই বললেন, পুত্র আবু হুরাইরা ! আল্লাহ তোমার কথা শুনেছেন। তুমি সাক্ষী থেকো। আমি কালেমা পড়ছি। "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আনন্দে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো। চোখে আনন্দাশ্রু সমেত সেই

সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার আম্মা ঈমানের সম্পদ লাভ করেছেন। একথা শুনে তিনিও খুব খুশী হলেন। আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করলেন এবং আমাকে কয়েকটি নসিহত করলেন।

অতপর আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরো একটি বিষয় নিবেদন করলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে এবং আমার আম্মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন এবং সকল মুমিন আমার ও আমার আম্মার প্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দোয়াও করলেন। পরওয়ারদিগার ! তুমি আবু হুরাইরা ও তার আম্মার প্রতি ভালোবাসা সকল মুমিনের অন্তরে দাও এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করো।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মকবুল দোয়ার পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে।

# মাতা-পিতার নাফরমানী

শিরকের পর সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো মাতা-পিতার নাফরমানী। আর এটা এতোবড় জঘন্য অপরাধ যে তা চিন্তা করতেই গা শিউরে উঠে। কৃতজ্ঞতা এবং ইহসান প্রকাশ এমন এক মৌলিক গুণ যা অবলম্বন করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এ মৌলিক গুণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে সে মানবতা শূন্য। এ ধরনের মানুষ আল্লাহর পসন্দনীয় মানুষ হতে পারে না। তারা না পারে আল্লাহর হক আদায় করতে। আর না পারে মানুষের অধিকার আদায় করতে। আল্লাহর পর সবচেয়ে বড়ো ইহসান হলো মাতা-পিতার। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ জীবন দান করেন। তাদের স্নেহ ও ভালোবাসার ছায়াতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। তারা নিজেদের অস্তিত্বকে ভুলে সন্তান প্রতিপালন করেন এবং সন্তানের আরাম-আয়েশের চিন্তায় নিজের আরাম-আয়েশ কুরবানী করেন। নিসন্দেহে শারাফাত, ইহসানমন্দী এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট দাবী হলো, অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাদের ইহসানকে স্বীকার করা। সারা জীবন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং নিজেকে ভুলে তাঁদের প্রতি সুন্দর আচরণে লেগে থাকা।

যদি কেউ আল্লাহর প্রতি শোকর গুজার হয়, আল্লাহর ইহসানের অনুভূতি রাখে এবং আল্লাহর অনুগত হতে চায় তাহলে সে কখনো মাতা-পিতার নাফরমান হতে পারে না। নাফরমান হওয়াতো অনেক দূরের কথা সে মাতা-পিতার প্রতি বেপরওয়াও থাকতে পারে না।

**জঘন্য গুনাহ**

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهٗ سَكَتَ -(بخارى، مسلم، ترمذى)

"হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি

বড়ো এবং জঘন্যতম গুনাহ সম্পর্কে কেন সতর্ক করবো না। আমরা সকলেই বললাম কেন নয়, অবশ্যই আপনি তা করবেন হে রাসূল ! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার নাফরমানী করা। তিনি ঠেস দিয়ে বসা থেকে উঠলেন এবং বললেন, খুব ভালো করে শুনে নাও, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা এবং তিনি বরাবর একথা বলে চললেন। এমনকি আমরা বললাম, আহা ! তিনি যদি চুপ মেরে যেতেন।”

হাদীসটিতে মাতা-পিতার নাফরমানী প্রসঙ্গে 'উকুক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কুরআনে হাকিমে মাতা-পিতার সাথে ইহ্সান করার ওসিয়ত করে যে যে বিষয়ে তাকিদ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করার নাম হলো উকুক। মাতা-পিতার প্রতি মুখাপেক্ষহীনতা, তাদের সাথে কঠোরতাপূর্ণ আচরণ, তাদের নির্দেশাবলীকে গ্রাহ্য না করা, তাদেরকে দুঃখ দেয়া এবং তাঁদের নাফরমানী করা এসবই 'উকুকের' মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা ভঙ্গীও চিন্তা করার মতো। বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ এবং অন্তর্স্পর্শী করার জন্য এ ধরনের বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রভাবশালী হয়ে থাকে। যদি আনুগত্যের আবেগ থাকে তাহলে শ্রবণকারীর অন্তরে এ জঘন্য ধরনের গুনাহর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণার উদ্রেক করে যে, তা চিন্তা করতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠে এবং তা ধারণা করতেই শরীর কেঁপে উঠে।

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের নিকট প্রথম প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সাহাবারা রাদিয়াল্লাহু আনহুম জবাব দেবেন, তা নয়। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তিনি তো মুক্তির পথ দেখাতে এসেছেন। এজন্য তাঁকে একথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি বলেছেন, তিনটি জঘন্য গুনাহ সম্পর্কে কেন সতর্ক করবেন না ? এভাবে তিনি একবার প্রশ্ন করে আসল কথা বলে দেননি। বরং তিনবার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, তোমাদেরকে কেন তিনটি বড়ো গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করবো না ?

বর্ণনাভঙ্গীর এ পদ্ধতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গুনাহকে মানুষের জন্য ধ্বংসকারী গুনাহ হিসেবে

মনে করেছেন এবং এটাও চেয়েছেন যে, শ্রবণকারী যেন অন্তরের কান দিয়ে এ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। অব্যাহতভাবে তিনবার সতর্ক করার পর যখন সাহাবীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেন তখন তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার নাফরমানী করা। অতপর এ জঘন্য গুনাহর দুশ্চিন্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও বিচলিত করে তোলে। তিনি ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। আবেগ ও উদ্বেগে তিনি উঠে বসেন এবং বলে উঠেন, হে মানুষেরা ! কান দিয়ে ভালোভাবে শুনে নাও। মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। অতপর তিনি আরো উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন ও একথাগুলো একের পর পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাহাবীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আশা করতে থাকেন যে, হায় ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি চুপ মেরে যেতেন।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে তিনটি বড়ো গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ সকল গুনাহর মধ্যে শিরকের পর মাতা-পিতার নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন হাকিমেও এ বর্ণনানুক্রমেই পাওয়া যায়। "বলে দিন, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন এসো তা আমি পড়ে শুনাই। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে।" আল্লাহর অধিকারের অস্বীকৃতিই হলো শিরক এবং মাতা-পিতার হক থেকে গাফলতি প্রদর্শন হলো নাফরমানী। চিন্তা করে দেখুন, সবচেয়ে বড়ো হক হলো স্রষ্টা আল্লাহর। আল্লাহর একত্ববাদের অস্বীকৃতি ও তার সাথে কাউকে শরীক করা হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। এটা এমন জঘন্য পাপ যে, তার ক্ষমা নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।" আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় হক হলো মাতা-পিতার এবং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মাতা-পিতার প্রতি নাশোকরী এবং নাফরমানী। কেননা আল্লাহ নিজের অধিকারের পর তাদের অধিকারের কথাই বর্ণনা করেছেন এবং নিজের প্রতি শোকর গুজারীর সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারীর নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তুমি আমার এবং নিজের মাতা-পিতার শোকর গুজার হবে। কতিপয় রাওয়ায়েতে এ বর্ণনানুক্রম নেই বলেই হয়তো সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি স্থানে এবং হাদীসেও এ ক্রমেই বর্ণিত হয়েছে।

## ইয়েমেনবাসীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত দিয়ে ইয়েমেনবাসীদের নিকট একটি স্মরণীয় পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতেও তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, "দেখ, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে ঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) অন্যায়ভাবে মুমিনকে হত্যা করা, (৩) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে পলায়ন করা, (৪) মাতা-পিতার নাফরমানী করা, (৫) পূত-পবিত্রা শরীফ মহিলাদের উপর তোহমদ আরোপ করা, (৬) যাদুটোনা শিখা, (৭) সুদ খাওয়া এবং (৮) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা।

## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীয়ত

হযরত মায়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, মায়াজ যদি না হতো তাহলে আমি অবধারিতভাবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ওসীয়ত করেছেন। একবার তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ওসীয়ত করেছেন, "আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়েও দেয়া হয় এবং কখনো মাতা-পিতার নাফরমানী করা উচিত নয় যদি তারা নিজের সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকার নির্দেশও দেয়।"

## মাতা-পিতাকে কাঁদানো

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম, আবেদ এবং যাহেদ ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। ৬০ বছর ধরে তিনি ফতওয়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, মাতা-পিতাকে কাঁদানোর অর্থ হলো তাদের নাফরমানী করা এবং এ কাজ জবরদস্ত গুনাহর কাজ।

## মাতা-পিতাকে গালমন্দ দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ - بخارى، مسلم، ترمذى وغيره

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন, মাতা-পিতার প্রতি গালি দান বড়ো গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। লোকজন (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ভালো, কেউ কি নিজের মাতা-পিতাকে গালিও দেয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বী হাঁ। মানুষ অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তাহলে (ফিরে) তার মাতা-পিতাকে গালি দিয়ে দেয়। সে অন্যের মা'কে খারাপ নামে স্মরণ করে। তাহলে সে তার মা'কে গাল-মন্দ করে।

এ হাদীস থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মাতা-পিতার মান-ইজ্জতের প্রতি আবশ্যিকভাবে নজর দিতে হবে। তারা যাতে কোনো ধরনের কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যের মাতা-পিতার প্রতিও এমন উক্তি করা যাবে না যাতে সে উত্তেজিত হয়ে আপনার মাতা-পিতাকে এক হাত নিয়ে বসে।

### অভিশাপ দেয়া

"হযরত আবু তোফায়েল বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে এমন কোনো কথা বলেছিলেন, যা অন্য কাউকে বলেননি ? তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাকে এমন কোনো কথা বলেননি যা অন্যকে বলেননি। হ্যাঁ আমার তরবারীর খাপে একটি লিখিত বাণী আছে। অতপর তিনি তরবারীর খাপ থেকে সে বাণী বের করলেন। তাতে লিখা ছিলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ। যে জমির সীমা বদলে দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। যে নিজের মাতা-পিতার উপর অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লানত এবং যে দীনের ব্যাপারে কোনো নতুন কথা সৃষ্টি করে তার উপরে আল্লাহর লানত।" মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করা এবং গালমন্দ দেয়া এমন জঘন্যতম খারাপ কাজ যা চিন্তা করা যায় না কিন্তু দুনিয়ার এ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে। ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা, অজ্ঞতা এবং নাদানীর কারণে অনেক সময় মানুষ এমন সব কাজ করে বসে যা সাধারণ অবস্থায় ধারণা করাও দুরূহ ব্যাপার।

মাতা-পিতাও তো মানুষ। তারাও মানবীয় দুর্বলতা থেকে পবিত্র নয়। তাদের মধ্যেও ঘৃণা, ভালোবাসা, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা অন্যান্য দুর্বলতা বিদ্যমান। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোনো সময় তারাও এমন কথা বলে বসতে পারেন অথবা এমন আচরণ করে ফেলতে পারেন যা তাদের নিকট থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত। এতে উত্তেজিত হওয়া যাবে না। তাদের অধিকার সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা যাবে না। মাতা-পিতা এমন দু ব্যক্তিত্ব যারা সন্তানের লালন-পালন ও আরাম প্রদানের জন্য নিজের সমগ্র জীবন বিলিয়ে দেন। তারা যে ধরনের আচরণই করুন না কেন, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা শোভনীয় নয়। তাদের গালমন্দ করা এবং সকল ইহসান ভুলে যাওয়াও উচিত নয়।

নিসন্দেহে মাতা-পিতাও কোনো সময় সন্তানের হক আদায়ে কমতি এবং নিজেদের অবাঞ্ছিত আচরণের মাধ্যমে সন্তানদেরকে নাফরমানী ও বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিতে পারেন। বিশেষ করে, যখন পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সন্তানদেরকে সৎ মা বা বিমাতার সাথে জীবন কাটাতে হয় তখন এ সকল ঘটনা ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের দুঃখজনক ঘটনার উদ্ভব হয়। সৎ মা সাধারণত বিভিন্নভাবে পিতাকে সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন এবং তার আন্তরিক কামনাই হয়ে দাঁড়ায় যে পিতা যেন সন্তানদের সম্পর্কে বিগড়ে যান। সাধারণত পিতাও নতুন স্ত্রীর কিছুটা মনোতুষ্টির জন্য এবং বারবার তার বলার জন্য নিজের সন্তানদের সাথে সৎ সন্তানের মতো আচরণ করতে থাকে। এমনিভাবে মা যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং সন্তানরা সৎ পিতার পাল্লায় পড়ে তাহলে সাধারণত সৎ পিতা আগের সন্তানদের সাথে ভালো আচরণ কোনোক্রমেই বরদাশত করতে পারে না এতোদূর না হলেও অন্তত সে চায় যে, পূর্বেকার সন্তানদের চেয়ে সে যেন নিজের সন্তানদেরকে বেশী ভালোবাসে। মাও কিছুটা স্বামীকে খুশীর জন্য এবং অনেকটা তার ইচ্ছার বলি হয়ে অনেক সময় খারাপ ব্যবহার করে থাকে। অথচ মা'র মতো ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে এটা অবশ্যই আশা করা যায় না। ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে এ অবস্থায় সামান্যতম হলেও মাতা-পিতা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে খান্দান এবং সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কর্তব্য হলো এ ধরনের মাতা-পিতার প্রতি লাগাম টানা। তাদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সামাজিক চাপের মাধ্যমে সন্তানদের সাথে সন্তাতের মতো আচরণে বাধ্য করা। কিন্তু সম্পর্কের কারণে সন্তানদেরকে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মাতা-পিতার ইজ্জত-আবরুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে

এবং এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবে না যা মায়ের ইজ্জতের পরিপন্থী হয়। সর্বাবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হলো, যথাসম্ভব কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের প্রমাণ দেয়া। জনৈক কবি কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"পিতা যে নির্দেশই দিন না কেন তা মানো, নিশ্চিত জেনো যে, পিতার আনুগত্যকারী কখনো অপমানিত হয় না।"

## নাফরমানীর শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায়

عَن اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهٗ بِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ـ رواه الحاكم

"হযরত আবি বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ যে গুনাহর শাস্তি চান তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু মাতা-পিতার নাফরমানীর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন।"–রাওয়াহুল হাকিম

মর্মার্থ হলো, অন্য গুনাহর শাস্তি প্রদানে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করেন এবং দুনিয়ায় সে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে মাহফুজ থাকে। কিন্তু মাতা-পিতার নাফরমানী এমন এক পাপ যে তার শাস্তি দুনিয়াতেই ভুগতে হয় আর আখেরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

## নাফরমানের নেক কাজ ফলহীন

হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোনো নেকী কাজ দেয় না। প্রথম শিরক, দ্বিতীয় মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং তৃতীয় জিহাদ থেকে পলায়ন।

অন্য এক সাহাবী আমর বিন মাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি,

নিজের মালের যাকাত দেই, রামাদানের রোযা রাখি। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে একথা বলে শেষ করলো সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে হবে (এবং তিনি হাতের দু আঙ্গুল উঠালেন), শর্ত হলো সে যেন মাতা-পিতার অবাধ্য বা নাফরমান না হয়।

# মা'র সাথে নাফরমানী

وَعَنْ اَبِىْ عِيْسٰى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِضَاعَةَ الْمَالِ - متفق عليه

"হযরত আবু ইসা মুগিরাহ ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্মরণ রেখো, আল্লাহ তোমাদের উপর মাতার নাফরমানী, বখিলী, লালসা এবং কন্যা শিশুদেরকে জীবিত দাফন করা হারাম করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অহেতুক কথাবার্তা, বেশী বেশী সওয়াল করা ও সম্পদ ধ্বংস করাকে অপসন্দ করেছেন।"–বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীস অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে হেদায়াতের এক বিশাল বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক মুমিন ও মুমিনাকে নিজের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধির জন্য এ ধরনের ব্যাপক হেদায়াতকে স্মরণ ও সদাসর্বদা তা খেয়াল রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কয়েকটি শব্দের মধ্যে ছ'টি বিশেষ হেদায়াত দিয়েছেন। তিনটি বস্তু তো আল্লাহ আমাদের জন্য হারাম করেছেন এবং অন্য তিনটিতে জড়িয়ে পড়াও আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয় কাজ। যে তিনটি জিনিস আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছেন তা অবলম্বন করা কোনো ঈমানদার মানুষই চিন্তা করতে পারে না। রইলো অপর তিন বিষয়। যা আল্লাহ অপসন্দ করেছেন। তাও হালকা দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না।

যে তিনটি বিষয় আল্লাহ হারাম করেছেন তাহলো ঃ মাতার নাফরমানী, বখিলী ও লালসা এবং কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করা।

**এক ঃ** এ হাদীসে শুধুমাত্র মাতার নাফরমানী থেকে দূরে থাকার বিশেষভাবে তাকিদ দিয়ে এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পিতার তুলনায় মাতার খিদমতেই মানুষ বেশী ব্যস্ত থাকে এবং পিতার চেয়ে মায়ের সাথে আচরণের ব্যবস্থা করা হয়। এমনিভাবে মাতার নাফরমানী যাতে না হয় সেদিকে বেশী নজর দান ও অনুভূতিশীল হওয়া

প্রয়োজন। মাতার আবেগ নাজুক ধরনের হয়। তারা অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য-কথাতেই তাঁর অন্তরে চোট লাগতে পারে। এমনও হতে পারে যে, বেপরওয়া বশত কোনো বিষয়কে হাল্কাভাবে দেখা হয়, অথচ তাতে মাতার মনে আঘাত লাগে। তাঁর অন্তর আহত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াতের অর্থ হলো, মাতার আবেগ ও অনুভূতি, অভ্যাস ও মেযাজ এবং পসন্দ-অপসন্দকে পুরোপুরি খেয়ালে রাখা, মা'কে দুঃখ দেয়া, নাফরমানী করা এবং অন্তর ভেঙ্গে খান খান করার চিন্তাও যেন মনে উদ্রেক না হয়, সে দিকে নজর দেয়া। মাতা তো সে ব্যক্তিত্ব যার খিদমতের প্রতিফল হলো জান্নাতের চির বসন্তের বাগান এবং তাঁর সন্তুষ্টির সওয়াব হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির গৃহ। আল্লাহর সন্তুষ্টির গৃহ জান্নাত কাঙ্ক্ষিত হলে মাতার খিদমত ও আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে।

**দুই ঃ** হাদীসটিতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক 'মানয়ান' দ্বিতীয় 'হা-তি'। 'মানয়ান' শব্দের অর্থ মানুষের উপর অন্যের যে সম্পদ ও অধিকার ওয়াজিব হয় তা সে দিতে হতচকিয়ে যায়। বিভিন্নভাবে তা আদায়ে সে বাধা দেয়। সে কারো আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকে না। 'হা-তি' শব্দের অর্থ হলো গ্রহণ করো। অর্থাৎ অন্যের নিকট থেকে নেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকা। অন্যের কাছ থেকে শুধুমাত্র নিজের হক দাবীই করা নয় বরং হক-নাহক কোনোদিকে নজর না দিয়ে বোচকা ভরার ব্যাপারে লেগে থাকা। কার্পণ্য এবং লোভের এ ধ্যান-ধারণা কখনো কোনো মুমিন ও মুমিনার মেযাজের সাথে মিল খেতে পারে না। তার দান ও গ্রহণের মাপকাঠি এক ধরনের হয়। অন্যের নিকট থেকে সে যে সকল অধিকার দাবী করে এবং যে আচরণের আকাঙ্ক্ষা করে ; অন্যের সাথে সে সে আচরণ করে এবং অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তরে তাদের সকল অধিকার আদায় করে। বরং সে এ ক্ষেত্রে এতো বদান্যতা ও প্রশস্ত অন্তরের পরিচয় দেয় যে, যদি কেউ তার অধিকার আদায়ে কমতি করে অথবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলেও সে তার সাথে ইহসান ও সুন্দর আচরণ করে থাকে।

**তিন ঃ** কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করা। ইসলামপূর্ব আরবে কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করার যুলুমপূর্ণ প্রথা ছিলো। সন্তান হত্যার আরো দু ধরনের পদ্ধতি ছিলো। অনেক মুশরিক মূর্তিদের ভয়ে ভীত হয়ে এবং তাদেরকে খুশী করার জন্য নিজের সন্তানকে হত্যা করতো। অনেক নাদান ও মূর্খ দারিদ্র ও অভাবের কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজের

প্রিয় সন্তানকে হত্যা করতো। কিন্তু হাদীসটিতে কন্যাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথাটি ছিলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ ধরনের যুলুমও কঠোরতার কথা চিন্তা করতেই শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়।

ইসলামের আগমনে এ যুলুমমূলক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়। কন্যা সন্তানরা এ জিল্লত ও যুলুম থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ঘরে ঘরে তাদের সাথে স্নেহ ও ভালোবাসার আচরণ শুরু হয়।

বর্তমানে আমাদের সমাজ যদিও ইসলামের বদৌলতে কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করার অভিশাপ থেকে পবিত্র। তবু দীনি সম্পর্কের অভাবের কারণে এবং ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক বাড়ীতেই ছেলেদের প্রতি যে ভালোবাসা দেখানো হয় তা মেয়েদের প্রতি দেখানো হয় না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে আনন্দ প্রকাশ করা হয় না যে আনন্দ প্রকাশ করা হয় ছেলে জন্ম নিলে। অনেক নাদান তো ছেলের প্রতি যে মুহাব্বাত ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে তা থেকে কন্যাদেরকে বঞ্চিত করে। বিশেষ করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে যেন পর হয়ে যায়। ইসলাম যে অংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে তা প্রদানেও সে যালেমরা প্রস্তুত থাকে না। এ পঁচা ধ্যান-ধারণার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা আল্লাহ আমাদের জন্য পসন্দ করেন না।

**এক** ঃ অযথা কথা বলা।

**দুই** ঃ বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং

**তিন** ঃ সম্পদ ধ্বংস করা।

অযথা কথা বলার অর্থ হলো নিজের জবানের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব অনুভব না করা। মনে যা চায় তাই বলা। যা শোনে তাই অপরকে শুনানো। কোনো কথা বাছ-বিচার না করে এবং বাস্তবতার সাথে তার কোনো মিল আছে কিনা তা চিন্তা-ভাবনা না করে অনর্গল বলে যাওয়া। অমুক মহিলা একথা বলেছেন, অমুক বেগমের এ ধারণা, অমুক মহিলার এ মত ছিলো। ইত্যাকার খামাখাই কথা বলা। প্রখ্যাত প্রবচন রয়েছে, "যে বেশী কথা বলে, তার ভুল বেশী হয়।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনেছে, তার উচিত হলো ভালো কথা বলবে নচেত চুপ থাকবে।"–মুসলিম

বাহুল্য প্রশ্ন করা। এক ধরনের মানুষ কোনো স্থানে একত্রিত হলেই একে অপরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে তোলে। বিশেষ করে এক ধরনের মহিলা আছেন, যারা এক স্থানে সমবেত হলেই পরিবার সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন করে বসেন। আরে বোন, তোমার ননদের ব্যাপারটা না কি ছিলো? তোমার এবং তোমার শাশুড়ীর মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিলো? দেবরের সাথে কি হয়েছিলো? তোমার কর্তা বাচ্চাদের ভালোবাসে তো? পড়শীদের বাড়ীতে কিছু পাঠাও তো? কোত্থেকে মেয়ের পয়গাম এসেছে? পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিষয়, বাইরের ঘটনাবলী, কায়-কারবার মোটকথা সকল বিষয়েই জানার জন্য একদম অধীর হয়ে উঠে। এমনকি কোনো কথা লকানোও যাবে না। তার এ অযাচিত প্রশ্নের জবাবে হয় ভুল বর্ণনা দিতে হয়। অনেক সময় কথা এড়িয়ে তার অসন্তুষ্টির শিকার হতে হয়। অনেক কথা এমন আছে যা অপরের নিকট বলা যায় না। বিশেষ করে পারিবারিক কথা। কিন্তু এ বিশেষ শ্রেণীর মহিলারা যেভাবেই হোক কথা বের করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। কিছু না বললে বলে থাকে বড্ড দেমাগ আছে দেখি। আবার কিছু বললে তা ভড় ভড় করে অন্যের নিকট বলে দেয়। স্থানে স্থানে নিজের মত প্রকাশ করে বেড়ায়। এমনিভাবে অন্যের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। প্রকৃত কথা হলো, এ ধরনের মহিলা জীবনের মূল্য সম্পর্কে গাফিল এবং মূর্খতার কারণে এমন সব সামাজিক অপরাধ করে বসে যাতে সমাজের শান্তি, বংশের ঐক্য এবং পারিবারিক শান্তি অযথা বিনষ্ট হয়। অহেতুক এদিকের কথা ওদিকে লাগানোর ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের ভুল বুঝাবুঝি এবং নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়।

এমনিভাবে কিছু লোক দীনি ব্যাপারেও অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করে থাকে। নতুন নতুন প্রশ্ন করাই তাদের কাজ। এভাবে তারা মস্তিষ্কের উর্বরা শক্তির পরিচয় দেয়। সাধারণত তারা আমলের ময়দানে পিছনে থাকে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য তারা নিজেকে সবজান্তা হিসেবে জাহির করে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও এক কথা থেকে তের কথা বের করতে তারা বড়ো ওস্তাদ। মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের কাজ হলো নিজের জীবনের মূল্য প্রদান। জীবনকে সুন্দর কাজে ব্যয় করা এবং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ কিসে সন্তুষ্ট হন সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা ও অহেতুক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে অহেতুক কথা-বার্তা পরিত্যাগ করবে।"–তিরমিযী

সম্পদ নষ্ট করার অর্থ হলো, তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করা। দীনের প্রয়োজনে তা খরচ না করা। প্রদর্শনী ও খ্যাতির আশায়, অহেতুক প্রথা, শরমহীন এবং বেদীনি কাজে তা ব্যয় করা। সম্পদ আল্লাহর আমানত। আল্লাহর মর্জি মুতাবেকই তা ব্যয় হওয়া উচিত।

গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, থালা-বাসন, বিছানা, ফার্নিচার, ঘড়ি, কলম, পুস্তকাদি, কাগজ মোটকথা সকল বস্তুই আল্লাহর নিয়ামত এবং সাথে সাথে আমানতও। সকল বস্তুই সুন্দরভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে। বেপরোয়া হয়ে তা নষ্ট করা যাবে না। আল্লাহর নিয়ামত ও আমানতসমূহের কদর না করে তা নষ্ট করা আল্লাহও পসন্দ করেন না।

### মা'র বদদোয়া

মা'র সন্তুষ্টি ও তার মমতাপূর্ণ অন্তরের দোয়া দীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। পক্ষান্তরে দীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক জিল্লতী হলো সন্তানের প্রতি মাতার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বদদোয়া।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিন ধরনের দোয়া এমন যা নিসন্দেহে কবুল হয়।

**এক** ঃ মযলুমের দোয়া।

**দুই** ঃ মুসাফিরের দোয়া এবং

**তিন** ঃ সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দোয়া।"

প্রথম যুগে জারিজ নামে একজন বুজর্গ ছিলেন। হযরত জারিজ রাহমাতুল্লাহ আলাই একজন নেককার ও ইবাদাত গুজার মানুষ ছিলেন। তিনি সবসময় শহর থেকে দূরে নিজের খানকাতে ইবাদাতে কাটাতেন। একজন রাখাল সারা দিন বকরী চরিয়ে তার খানকায় রাত কাটাতো।

একদিন হযরত জারিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইর মাতা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। হযরত জারিজ রাহমাতুল্লাহি আলাই নামায পড়ছিলেন। মা তাকে ডেকে বললো, জারিজ ! তিনি চুপ থেকে নামায পড়াই উত্তম মনে করলেন। দ্বিতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটালো। মা এলেন এবং তাকে ডাকতে লাগলেন। তিনি একই ধরনের চিন্তা করে চুপ থেকে নামায পড়তে লাগলেন এবং মায়ের ডাকের জবাব দিলেন না। তৃতীয় দিন মা পুনরায় পুত্রের নিকট এলেন এবং ডাকতে লাগলেন। নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেয়া যায়। একথা ভেবে তিনি চুপ রইলেন। এ অবস্থা দেখে মা খুব দুঃখ পেলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বদদোয়া করলেন। তিনি আল্লাহর

নিকট ফরিয়াদ করে বললেন, হে আল্লাহ ! খারাপ মেয়েদের পাল্লায় না পড়া পর্যন্ত যেন জারিজের মৃত্যু না হয়।

একথা বলে নিরাশ হয়ে মা সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুদিন পরই একদিন বনী ইসরাঈলের লোকজন হযরত জারিজের নেক কাজ ও ইবাদাতের কথা আলোচনা করছিলো। এমন সময় সেখানকার এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা বলে উঠলো, "তোমরা যদি বলো তাহলে তাকে পাপে ফঁসিয়ে দিই !" এরপর সে মহিলা হযরত জারিজের খানকায় উপস্থিত হলো এবং অপকর্মের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলো। আল্লাহ পাক হযরত জারিজের উপর রহমাত নাযিল করলেন এবং তিনি সে বদকার মহিলার ষড়যন্ত্র থেকে পরিষ্কার পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে মহিলাটি হযরত জারিজের খানকায় অবস্থানরত রাখালের নিকট গেলো। রাখালটি ষড়যন্ত্রের শিকার হলো এবং নিজের মুখে কালিমা লেপন করে বসলো। অতপর যখন সে মহিলার বাচ্চা হলো তখন সে প্রচার করলো যে, এতো জারিজের পুত্র। এ খবর যখন বাদশাহর নিকট পৌঁছলো তখন সে খানকাহ ভেঙ্গে ফেলার এবং তাকে তার কাছে ধরে আনার নির্দেশ দিলো।

লোকজন হযরত জারিজের খানকাতে উপস্থিত হয়ে তা ভেঙ্গে ফেললো এবং তাঁকে বেদম প্রহার করলো। অতপর পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে তাঁকে বাদশাহর নিকট নিয়ে এলো। যখন পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন রাস্তায় কতিপয় বদকার মহিলা তাকে এ অবস্থায় দেখে হাসতে লাগলো। তাদের হাসতে দেখে হযরত জারিজও মুচকি হাসি দিলেন।

বাদশাহ হযরত জারিজকে বললো, এ মহিলা কি বলে ? তিনি বললেন, বলুন কি বলে। বাদশাহ বললো, সে বলে শিশুটি জারিজের। জারিজ রাহামাতুল্লাহি আলাই বললেন, শিশুটিকে আনা হোক। শিশুটিকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, তাকে নামায পড়ার সুযোগ দেয়া হোক। তিনি নামায পড়লেন। নামায থেকে যখন ফারেগ হলেন, তখন তিনি নিজে আঙ্গুল শিশুর পেটে মেরে বললেন, বল তোর বাপ কে ? আল্লাহর নির্দেশে শিশুটির জবান খুলে গেলো এবং সে বললো, অমুক রাখাল আমার বাপ। অতপর লোকজন হযরত জারিজের হাত ও পায়ে চুমু দেয়া শুরু করলো। তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলো। বাদশাহও অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং সে হযরত জারিজকে বললো, হযরত আপনার খানকা কি স্বর্ণ দিয়ে

বানিয়ে দেবো ? তিনি বললেন, না। তবে, যেভাবে মাটির ছিলো, সেভাবেই বানিয়ে দিন।

বাদশাহ বললো, আচ্ছা হযরত একটি কথা কি বলবেন ! রাস্তায় যখন কিছু বদকার মহিলা আপনার প্রতি বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসছিলো তখন আপনি মুচকি হাসি হাসছিলেন কেন ? তিনি বললেন, এটা এমন একটি গোপন কথা যা শুধু আমিই জানি। যা কিছু ঘটেছে তা সবই আমার মায়ের বদদোয়ার প্রতিফল। মার বদদোয়া লেগেছে আমার এবং তিনি মার বদদোয়ার পুরো কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

**মা'র নাফরমানীর শিক্ষণীয় শাস্তি**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা শুনলে মুখ দিয়ে কলিজা বের হয়ে আসে। কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! একজন যুবকের মুমূর্ষ অবস্থা। লোকজন তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার উপদেশ দিচ্ছে। অথচ তার মুখই খুলছে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কি নামায পড়তো ? সে বললো, জ্বী হাঁ। নামায পড়তো। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং তার সাথে চললেন। আমরাও পিছু পিছু চললাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের নিকট পৌঁছলেন। তখন মৃত্যু পূর্ববর্তী অবস্থা। তিনি তাকে কালেমা পড়ার তালকিন দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমিতো বলতে পারি না। তিনি বললেন, কেন ? কি ঘটনা ? জানা গেলো সে মাতার নাফরমানী করে থাকে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তার মা কি জীবিত আছেন ? সবাই বললো, জ্বী হাঁ। জীবিত আছেন। প্রিয় নবী তার মা'কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। যখন তার বৃদ্ধা মাতা এলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, বড় বিবি ! একি তোমার পুত্র ? সে বললো, জ্বী হাঁ, আমারই পুত্র। তিনি বললেন, বড় বিবি। এটা বলো, যদি এক ভয়ংকর আগুন প্রজ্জ্বলন করা হয় এবং তোমাকে বলা হয় যে যদি সুপারিশ করো তাহলে সে পরিত্রাণ পায়। নচেৎ তাতে সে নিক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থায় কি তুমি সুপারিশ করবে ? বৃদ্ধা বললো, জ্বী হাঁ। সে সময় তো আমি অবশ্যই সুপারিশ করবো। একথা শুনে রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছো।

বৃদ্ধা বললেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার কলিজার টুকরার প্রতি রাজী হয়ে গেছি।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে যুবকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" মাতার সন্তুষ্টির বরকতে যুবকের মুখ খুলে গেলো এবং সে তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়লো। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমার অসিলায় এ নওজোয়ানকে জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন।–তিবরানী, আহমদ

# এক নজরে মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণের ফল

**এক ঃ** আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত হলো মাতা-পিতা, মানুষের জন্মগ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার বড়ো অবদান। আপনি তাঁদের ইহসানের স্বীকৃতি জানালে আল্লাহর ইহসানের স্বীকৃতি জানালেন। আর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেন।

**দুই ঃ** মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখুন–তাহলে আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনার কোনো অবহেলা বা নাফরমানীর কারণে তাঁরা নাখোশ হলে আল্লাহ আপনার উপর নাখোশ হবেন। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

**তিন ঃ** মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ ও তাঁদের খিদমত করা জিহাদ করার সমতুল্য বরং কোনো কোনো সময় তার থেকেও বড়ো কাজ। আপনি তাদের খিদমতে রত থাকলে মুজাহীদিনের ন্যায় আপনিও দীন প্রতিষ্ঠাকারীদের দলে গণ্য হবেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে ময়দানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী আপনিও।

**চার ঃ** মাতা-পিতার সন্তুষ্টি বেহেশতের চাবিকাঠি। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে।

**পাঁচ ঃ** যাকে আল্লাহ তাআলা মাতা-পিতার খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে আসলে বেহেশতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগ কাজে লাগাবে তাকে আল্লাহ জান্নাত দেবেন। আর যে এ সুযোগ গ্রহণ করবে না সে ধ্বংস হবে।

**ছয় ঃ** আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা, হজ্জ ও ওমরা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কেউ যদি মাতা-পিতার খিদমত করতে থাকে আল্লাহ তাকে হজ্জ ও ওমরাকারীর সমতুল্য সাওয়াব দেবেন।

**সাত ঃ** আপনি আপনার মাতা-পিতার আদব ও সম্মান করলে আপনার সন্তানও আপনাকে সম্মান করবে। আপনি আপনার মাতা-পিতার ভালো করলে আল্লাহ তাআলা আপনার সন্তানদেরকেও সে শিক্ষাই দেবেন।

**আট ঃ** মাতা-পিতার খিদমতে সমস্ত মসিবত ও দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে যায়।

**নয় ঃ** মাতা-পিতার আনুগত্য, আদব ও সম্মান প্রদর্শন হতে কখনও দূরে থাকবেন না। এতে হায়াতে বরকত এবং রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত হবে।

# সন্তানের অধিকার

- সন্তানের মর্যাদা
- লালন-পালন
- সুন্দর আচরণ
- ভালো নাম রাখা
- স্নেহ ও ভালোবাসা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- বিবাহ

# সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা

সন্তানের সাধ কার না হয়। এমন গৃহ নেই যেখানে সন্তানের চাহিদা নেই। বাস্তব ব্যাপার হলো, সন্তানের উপস্থিতিতে গৃহে বরকত আসে এবং সন্তানই গৃহের শোভা বর্ধন করে। সে গৃহতো শোভা সৌন্দর্যহীন যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুদের কল-কাকলি নেই। বিশেষ করে যে গৃহে শিশুর কল-গুঞ্জন থাকে না সে গৃহকে মহিলারা ভীতিপ্রদ বলে মনে করে। মহিলারা তো শিশুর আশায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে থাকে। কল্পনা রাজ্যে তারা কখন কোল আলোকিত করে শিশুর শুভাগমন ঘটাবে সে জন্য ইনতিজার বা অপেক্ষা করতে থাকে। কখন সে শিশু আম্মু আম্মু বলে ডাকবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। শিশুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের খুশী ও আনন্দ অবলোকের জন্য সে ব্যস্ত হয়। এ খুশীর জন্য সে দিন গুণতে থাকে এবং নিজের আত্মিক আনন্দের বদৌলতে অভ্যন্তরীণ সুস্থতা অনুভব করে। কখনো কখনো সে কল্পনা জগতে প্রাণ প্রিয় সন্তানের সুন্দর বা অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত ভবিষ্যত এবং হাসি-খুশীপূর্ণ বসন্তের কথা চিন্তা করে নিজের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। অতপর কৃতজ্ঞতার আবেগে আল্লাহর নিকট মস্তক অবনত করে দেয়। সে ভাবতে থাকে যে, তার মতো দুর্বল অস্তিত্বের উপর আল্লাহ্ কত বড়ো ইহসান করেছেন এবং তার অস্তিত্বকে মানব সমাজের জন্য কতো অমূল্য ও প্রয়োজনীয় হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। আল্লাহ্ মহিলাদের প্রকৃতিই কিছুটা এমন করে তৈরি করেছেন যে, তারা জীবনটাই সন্তানের জন্য মনে করে এবং সন্তানের জন্য জীবনটা কুরবানী করে অগাধ শান্তি ও খুশী অনুভব করে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে নিজের কলিজার টুকরাকে শরীর ও মনের শরীক রেখে একদিন একদিন করে সময় গুণতে থাকে এবং যখন আল্লাহ্ পাক নিজের ফযিলতের মাধ্যমে একটি শিশু উপহার দিয়ে তার কোল ভরে দেন এবং তখন স্নেহের দৃষ্টিতে সে নবজাতকের প্রতি দৃষ্টি ফেলে। এ সময় সে চিন্তার জগত থেকে সে সব দুঃখ-কষ্টের চিত্র ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয় যা শিশুর জন্মদান পর্যন্ত স্বীকার করে থাকে। অতপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায় হলো শিশুর লালন-পালনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পর্যায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি মহান সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ পাক উদারতার সাথে তাদের অসাধারণ আবেগ, দুঃখ-কষ্ট স্বীকারের নজীরবিহীন হিম্মত ও ধৈর্য এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য মহিলাদের মধ্যে সুউচ্চ নৈতিক যোগ্যতাবলীও দান করেছেন।

মহিলারা শুধু দায়ে ঠেকেই এ সকল দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে না বরং প্রাকৃতিক দাবী অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করে থাকে। সন্তান জন্মদানের জন্য বার বার মৃত্যুর জন্য অগ্রগামী হবার নজীরবিহীন সাহস সে রাখে। সন্তানের লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য সে নিজের সাধ-আহলাদ ও রূপ-যৌবন কুরবানী করায় প্রগাঢ় শান্তি এবং আনন্দ অনুভব করে থাকে।

**মুসলমান মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য**

মহিলাদের চিন্তাধারা যদি ইসলামী হয়, তাহলে দুঃখ-কষ্ট সহ্যের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত বলে চিন্তা করে থাকে। সর্বোপরি সে মনে করে যে, সে ইবাদাতে মশগুল আছে। ইসলাম প্রতিটি মহিলার অন্তরে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, মহিলাদের এ শারীরিক ও প্রকৃতিগত কাজ, প্রতিদান এবং তার উপকারিতা শুধুমাত্র এ নশ্বর জগতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তার দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ও কুরবানীর প্রতিটি কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে ইবাদাত ও জিহাদের সমতুল্য। প্রত্যেক মহিলা যারা এসব মুসিবত সহ্য করে এবং সন্তানদের জন্য কুরবানী প্রদান করে প্রকৃতপক্ষে তারা জিহাদে তৎপর এবং আল্লাহর ইবাদাতে ব্যাপৃত থাকে। এ জিহাদ ও ইবাদাতের পার্থিব ফায়দাও আছে। কিন্তু মুসলমান মহিলাদের দৃষ্টি চিরকালীন নেয়ামতসমূহের প্রতিও নিবদ্ধ থাকে। আর এ সকল নেয়ামত পরকালীন জীবনে লাভ হবে। মুসলমান মহিলার স্বাতন্ত্র হলো, সন্তানদের জন্য বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, নিজের সাধ-আহলাদ, আবেগ এবং রূপ-যৌবন কুরবানী করে, বদলায় সে শুধু পার্থিব উপকারই লাভ করে না (এ পার্থিব লাভ কখনো হয়, আবার কখনো হয় না) বরং পরকালের চিরকালীন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভ করবে। জান্নাতও সে জান্নাত যেখানে তার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করা হবে। প্রত্যেকটি আবেগ পূরণের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে এবং তাকে এমন রূপ ও যৌবন দান করা হবে যা কখনো নষ্ট হবে না। আর এ রূপ-যৌবন বার্ধক্যের আশংকামুক্ত থাকবে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণার একটি উত্তম দিক হলো, মুসলমান মহিলা যদিও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনের পর দুর্ভাগ্যবশত পার্থিব মঙ্গল থেকে বঞ্চিতও হয় তাহলেও সে নিরাশ হয় না এবং দায়িত্ব পালনেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে শান্তি ও আন্তরিক আবেগের সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। সন্তানদের জন্য সকল ধরনের দুঃখ সহ্য এবং ত্যাগ স্বীকারের পরও যদি সে সন্তানদের নিকট থেকে কোনো সুখ না পায়

ও সন্তানরা যদি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ভেঙ্গে খান খানও করে দেয়, তবুও সে নিরাশার শিকারে পরিণত হয়ে নিজের কাজে লজ্জিত হয় না। এ প্রশ্নে ভবিষ্যতের জন্যেও সে ভুল চিন্তা করে না। কেননা সে অবগত যে, মুমিন মহিলার আসল এবং প্রকৃত সাফল্য হলো পরকালীন সাফল্য। একথা ভেবে সে সবসময় সান্ত্বনা পায় যে, আল্লাহ আখেরাতে তার কাজের বদলা দেবেন। আর এ বদলা এতো পরিমাণ হবে যে, তাতে পস্তানোর কোনো প্রশ্নই নেই। সেখানকার প্রতিদান ছিনিয়ে নেয়ারও কোনো আশংকা থাকবে না। এজন্য সারাটা জীবনে সে সকল কাজকে ইবাদাত ও আল্লাহর পথে জিহাদ মনে করে তৎপর থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ اِذَا حَمِلَتْ كَانَ لَهَا اَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلاَ تَدرِى الْخَلاَئِقُ مَا لَهَا مِنَ الْاَجْرِ وَاِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ اَوْرَضْعَةٍ اَجْرُ نَفْسٍ تُحْيِيْهَا وَاِذَا اَفْطَمَتْ ضَرَبَ الْمَلَكِ عَلٰى مَنْكَبِهَا وَقَالَ اِسْتَانِفِى الْحَمَلَ - كنز العمال

"মহিলা যখন আশায় থাকে, তখন গর্ভ ধারণের পুরো সময়টাই সে প্রতিদান ও সওয়াব পায় যেমন সওয়াব ও প্রতিদান একজন রোযাদার, রাত জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বান্দাহ পেয়ে থাকে। এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময়কার কষ্টের বিনিময়ে যে প্রতিদান ও সওয়াব তা আন্দাজ সৃষ্টজীব করতে পারে না। সে সওয়াব যে কি এবং কতো তা ধারণাই করা যায় না। মহিলার চীৎকারের পর যখন শিশু জন্ম নেয় (এবং সে তাকে নিজের দুধ পান করিয়ে পালন করে) তখন দুধের প্রতিটি ঢোকে সে সেই সওয়াব ও প্রতিদান পায় যা একজনকে জীবনদানের জন্য পাওয়া যায়। এবং যখন (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধ পান করিয়ে) দুধ ছাড়ানো হয় তখন আল্লাহর ফেরেশতা (সম্মান ও ভালোবাসায়) তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বলতে থাকে (আল্লাহর দাসী !) এখন দ্বিতীয়বার গর্ভ ধারণের জন্য প্রস্তুতি নাও।"

**মা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা**

যে মহিলা বার বার নিজের জীবনকে বিপদসংকুল করে, শরীর ও জীবনী শক্তিকে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে সন্তান জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে সে

স্বাভাবিকভাবেই সে সন্তানের নিকট কিছু আশা করে। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তার সন্তানদের ভবিষ্যত শানদার হোক, ভাগ্যবান হোক, খিদমত গুজার হোক, মা'র চিন্তাধারা ও আদর্শ অনুযায়ী উত্তম ভবিষ্যত গঠনকারী হোক, মাতা-পিতার দীন ও সভ্যতার সংরক্ষক হোক, নজীরবিহীন অনুগত হোক। যখন সে অবলোকন করে যে, সন্তানরা তার স্বপ্ন-সাধকে বাস্তবে রূপায়িত করছে ও ইচ্ছানুযায়ী লালিত পালিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তাদেরকে উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে উত্থিত করেছে তখন তার আনন্দ ও গৌরবের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

## সন্তানদের সম্পর্কে সাধারণ অভিযোগ

কিন্তু এ সন্তান যাদের খিদমতে দুর্বল মা রাত-দিন ব্যস্ত থেকে শরীর ও জীবনের শক্তি ব্যয় এবং হাত প্রসারিত করে সবসময় দোয়া করে থাকে, তারাই যদি মায়ের স্বপ্ন-সাধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং নাফরমান ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে মা'র কি অবস্থা দাঁড়ায়। তার মানসিক ও অন্তরের জ্বালা এবং যাতনা কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

বর্তমান যুগে কতিপয় ভাগ্যবান পরিবার ছাড়া প্রতিটি পরিবারে একই ক্রন্দন এবং হা-হুতাশ। সকলেরই একই বক্তব্য সন্তানদের অবস্থা অবর্ণনীয়। পুত্র হোক অথবা কন্যা হোক মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে তারা গাফেল। মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং আনুগত্য প্রকাশ একদমই তাদের ধাঁতে নেই। মনে হয় মাতা-পিতার সাথে আচরণ, সন্তুষ্টি, খিদমত, সম্মান প্রদর্শন, আবেগ-অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি যেন অর্থহীন কথা। একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, সন্তানরা অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। যে মজলিশেই বসুন, যে গৃহেই যান একই কথা শুনতে পাবেন এবং মাতা-পিতাকে একই ব্যাপারে ক্রন্দনরত দেখতে পাবেন। অতপর কিছু বয়স্ক বৃদ্ধা নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে থাকবেন, আরে বেটি ! আমাদের সময়ে কি সন্তানরা মাতা-পিতার সামনে উঁচু স্বরে কথা বলতে পারতো ! এরপর খারাপ পারিপার্শ্বিকতা, রঙিন কাল, ভুল ও খারাপ চিন্তাধারার প্রসার, অশ্লীল সাহিত্য, নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ইত্যাদির লম্বা কাহিনী শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মহিলা এক ধরনের শান্তি অনুভব করে চিন্তা করতে থাকে যে, এ অবস্থায় এছাড়া আর কি হতে পারে। মাতা-পিতার আর কি করণীয় থাকতে পারে। এ পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক।

## মাতা-পিতার চিন্তার বিষয়

নিসন্দেহে মাতা-পিতার সামর্থ্যে সবকিছু থাকে না। কিন্তু নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সামর্থ্য তো তাদের আছে। আল্লাহর দীনের আলোকে নিজেদের কাজ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, সন্তানদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও লালন-পালনের ব্যাপারে আল্লাহ মা'র উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা পালনে কোনো ত্রুটি হচ্ছে নাতো ? সন্তানদের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় কোনো জটিলতা নেই তো ? আল্লাহ তাদের যে অধিকার প্রদান করেছেন তা প্রদানে কোনো কমতি করছেন না তো ? সন্তানরা তখনই আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে যখন আপনিও তাদের অধিকার সম্পর্কে গাফেল না হন। সন্তানকে আপনি যে নৈতিক চরিত্রে বিভূষিত দেখতে চান, যে ধরনের সৌভাগ্যবান, খিদমত গুজার, অনুগত এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী আশা করেন তা পূরণ হতে পারে। আপনি যদি সেসব দায়িত্ব অনুভব করেন এবং তনু-মন-ধন দিয়ে তা পূরণ করেন। সন্তানের অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহ নিসন্দেহে দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু এটাও চিন্তার বিষয় যে, তাদের এ অবস্থা মাতা-পিতার গাফলতি ও দায়িত্ব সচেতনতার অভাবের ফলশ্রুতি কিনা। সে সন্তান আপনার অধিকার সম্পর্কে কি করে চিন্তা করবে যাকে আপনি অধিকারের অনুভূতিই দেননি। সে সন্তান মাতা-পিতার খিদমত ও সম্ভ্রমের কথা কিভাবে চিন্তা করতে পারে যাকে কোনো সময় বলাই হয়নি যে, মাতা-পিতার খিদমত ও সম্মান করা সন্তানের উপর ফরয। আপনি যদি তাদের আবেগ ও অনুভূতির কথা খেয়াল না করেন তাহলে তারা আপনার আবেগ ও অনুভূতির খেয়াল রাখা কার কাছ থেকে শিখবে। আপনি যদি তাদের ভালো না বাসেন এবং নিজের আচরণ দিয়ে তাদেরকে এটা বুঝিয়ে থাকেন যে, তাদের লালন-পালনের কষ্টের তুলনায় তাদের মৃত্যুই বেশী পসন্দ করেন ; তাহলে তারা আপনাকে ভালোবাসা ও আপনার খিদমত করার কথা কিভাবে চিন্তা করবে। আপনি যদি নিজের আরাম-আয়েশের সবকিছু বুঝে থাকেন এবং তাদের প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রয়োজনের অনুভূতি তাদের কোত্থেকে আসবে। আপনি যদি সমাজ সংস্কার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনে কোনো বিশেষ আদর্শের ধারক-বাহক হন, তাহলে সে আদর্শের মর্যাদা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা না করে তাদেরকে সে আদর্শের ধারক-বাহক কিভাবে হতে বলেন। সন্তানদের নিকট থেকে সে আশাই করুন যার জন্য তাদেরকে তৈরি করেছেন এবং সে ধরনের আচরণই আশা করুন যে ধরনের আচরণ তাদের সাথে করেছেন।

"হযরত নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার পিতা [হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু] আমাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি নুমানকে অমুক অমুক জিনিস দিয়ে দিয়েছি। একথার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ ধরনের উপঢৌকন দিয়েছো ? তিনি জবাবে বললেন, না। সবাইকে তো দেইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। অতপর তিনি বললেন, তুমি কি এটা পসন্দ করো না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক। বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কেন নয়। তিনি বললেন, তাহলে এ ধরনের করো না।"–আল আদাবুল মুফরাদ

এ হাদীসের এ অংশ বিশেষভাবে চিন্তা করার মতো। "তুমি কি এটা পসন্দ করো না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক।" অর্থাৎ শিশু আপনার আচরণেই শিক্ষাগ্রহণ করে যে, মাতা-পিতার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে।

শিশুর চরিত্র ও চাল-চলন গঠনে মাতা-পিতা ছাড়া অন্যান্য কার্যকারণও সক্রিয় থাকে। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা এসবই নিজস্ব সীমায় ভাঙ্গা-গড়ার কাজে দায়িত্বশীল। কিন্তু এখানে শুধু মাতা-পিতার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। সন্তানদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বাবলী কি এবং তাদের ব্যাপারে সন্তানদের কি কি অধিকার রয়েছে তা আলোচনা করা হবে।

## সন্তানের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

প্রত্যেক মা'ই এটা চায় যে, তার সন্তান তার অন্তরের শান্তি এবং চক্ষু শীতলকারী হোক। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য ইজ্জত ও আরামের মাধ্যম হোক। তার বংশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হোক। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা নিসন্দেহে মর্যাদা পাবার যোগ্য। কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষাই শুধু দোয়ার মাধ্যমে পূরণ হয় না। আপনাদের দোয়া পবিত্র, আপনাদের আকাঙ্ক্ষাও পবিত্র ; কিন্তু শুধু দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। নিজের দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে চেষ্টার হক আদায় না করলে তা কখনো সাফল্যের রূপ দেখবে না।

সন্তানের ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা কে না করে থাকে। কোনো মা এ আশা করে যে, তার সন্তান ভ্রষ্ট পথে চলুক ? সন্তানের খারাপ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তরে বাজে। সন্তান যদি লজ্জিত এবং ব্যর্থ হয় তাহলে কোন্ মা'র চক্ষু দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত না হয়। আর সন্তানের সার্থক ভবিষ্যত দেখে কোন্ মা খুশীতে বাগ বাগ না হয়। কিন্তু শুধু ভালো আবেগ-অনুভূতি দিয়েই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হলো তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং তাদের অধিকার আদায়ের পুরো চেষ্টা করা। আপনি নিজের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই না রাখেন তাহলে আপনি তাদের অধিকার কিভাবে আদায় করবেন।

সন্তানের অধিকারসমূহ আদায়ে আপনাকে এজন্যও তৎপর হওয়া প্রয়োজন যে, এটা আপনার দীনি দায়িত্ব। তাদের অধিকারসমূহ আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং একদিন তিনি এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হলো ঃ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ متفق عليه

"এবং মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক। তোমরা সবাই (নিজ নিজ অবস্থা) অনুযায়ী রক্ষক এবং তোমাদের সকলের নিকটই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"–বুখারী ও মুসলিম

নিসন্দেহে পিতাও নিজের সন্তানের রক্ষক এবং তাদের অধিকারসমূহের জিম্মাদার। কিন্তু এটা বাস্তব যে, মা'র দায়িত্ব কিছুটা বেশী। পিতা জীবিকার জন্যে দৌড়-ঝাপের কারণে বেশীর ভাগ সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করে। গৃহে সবসময় মাতাই শিশুদের সাথে থাকেন এবং শিশুও মা'র প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়। শিশুদের উপর খেয়াল দেয়ার জন্য প্রকৃতিগতভাবেই মা বেশী সময় এবং শিশুও মায়ের প্রভাব কিছুটা বেশী গ্রহণ করে।

**সন্তানের অধিকার**

আর এটাও বাস্তব যে, শিশুদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন এবং তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক নিজের হিকমতের অধীন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা বেশী দান করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, দয়া ও নম্রতা এবং ভালোবাসার মৌলিক গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশী দান করা হয়েছে। আর এজন্যই তাদের উপর আল্লাহ পাক যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য ঐসব গুণাবলীর বেশী প্রয়োজন।

**সন্তানের ৭টি অধিকার**

**এক :** সন্তানের কদর ও মূল্য

**দুই :** লালন-পালন

**তিন :** সুন্দর আচরণ

**চার :** ভালো নাম রাখা

**পাঁচ :** স্নেহ ও ভালোবাসা

**ছয় :** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং

**সাত :** বিয়ে।

সামনে আমরা এ সাত অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সন্তানের জন্য অন্তর ভরা দোয়ার সাথে সাথে এসব অধিকারের প্রতি গভীর ধারণা এবং তা আদায়ের পূর্ণ ব্যবস্থাই আপনার সন্তান আপনার চক্ষুকে সুশীতল করতে পারে।

# সন্তানের কদর ও মূল্য

সন্তানের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার প্রতি আপনার মর্যাদা ও মূল্যের অনুভূতি থাকা। তার অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সন্তানকে নিজের জন্য আল্লাহর রহমাত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। আপনি যদি তার অস্তিত্বের মূল্য দিতে সফল না হন তাহলে তার অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করতে পারবেন না অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগই আপনি দেবেন না অথবা এ সুযোগ এলেও আপনি অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবেন না।

সন্তানের সাথে সঠিক আচরণের জন্য তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য জানা অতি আবশ্যকীয় ব্যাপার। সন্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত। সন্তান ঘরের শোভা, খায়ের ও বরকত এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের সমান। সন্তান দুনিয়ায় আপনার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের সাহারা বা সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত। আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। আপনার প্রিয় ধ্যান-ধারণা বা আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম হয়। আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রথাকে সে অব্যাহত রাখে এবং আপনার উত্তরাধিকার হয়ে পরবর্তীতে সে আপনার কীর্তিকে জীবিত রাখে।

দীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তান আল্লাহর নজীরবিহীন পুরস্কার। দীনি কাজে সে আপনার উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকার। দীনি কাজের জবাবদিহিতে সে আপনার চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরের শান্তি। আপনার দীনি প্রথা ও আদর্শের সংরক্ষক এবং উত্তরাধিকার। এজন্যেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً -

"হে আমার আল্লাহ ! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো।"

এ দোয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তাহলো, সন্তান তার পর দীনি উত্তরাধিকার হবে এবং পিতার মিশন পূর্ণ করবে।

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا - يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ -

"(হে আমার রব) তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে।"

অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবার থেকে দীনের যে আলো প্রসারিত হয়েছিলো তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নির্বাপিত হতে দেবে না। সত্য কথা হলো, নেক সন্তান দুনিয়াতেও বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখেরাতেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে।

## জান্নাতে বিশেষ মহল

আপনার জীবদ্দশায় যদি সন্তানের মৃত্যু হয় এবং আপনি সে মৃত্যু শোক সবর ও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখেরাতের সঞ্চয়, জান্নাতের ওসিলা এবং বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম হবে। এ সবরের বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনাকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং সেখানে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরি করবেন। সে মহলের নামই হবে "শোকরের মহল।" হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - جامع ترمذى

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করে নিয়েছো। ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রূহ্ কবজ করেছো ! ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, অতপর আমার বান্দাহ্ কি বলেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে। এবং এ মুসিবতে সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম "শোকরের মহল" রাখার নির্দেশ দেন।"

"হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মুসলমান দম্পতিরই তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এসব নিষ্পাপ শিশু জবাব দেবে যে, যতক্ষণ আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে দাখিল না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে যেতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা সকলেই জান্নাতে যাও।"-তিবরানী

### সন্তান সাদকায়ে জারীয়াহ

সন্তানের জীবদ্দশায় আপনি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে যার সওয়াব দুনিয়া থাকা পর্যন্ত আপনার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই মানুষের আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লেখা হতে থাকে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ - صحيح مسلم

"যখন মানুষ ওফাত পায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এসবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকেন)। কাজ তিনটি হলো, এমন সাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে।"

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন, যখন মাইয়্যেতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো ? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার

সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।"

"হযরত ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার ! আবু হুরাইরাকে ক্ষমা করো। হে পরওয়ারদিগার ! আবু হুরাইরার মা'কে ক্ষমা করো এবং পরওয়াদিগার ! সে সকল লোককেও ক্ষমা করে দাও যারা আবু হুরাইরা ও তার মা'র জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। সুতরাং আমরা বরাবর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার মা'র জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়ায় শামিল থাকি।"

### সন্তান হত্যা জঘন্যতম পাপ

মুসলমান সমাজ যদিও বর্তমানে দুঃখজনক পশ্চাৎগমন এবং শিক্ষণীয় পতনে ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্বে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি অর্জনের সাহসও হারিয়ে বসেছে এবং আখেরাতে বুলন্দ মর্যাদা হাসিলের শিক্ষাও ভুলে গেছে। এ সত্ত্বেও তাওহীদে এবং দীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রক্ষার বদৌলতে মুসলমান মহিলাদেরই এ বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যে, তারা কিছু গুনাহর ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারে না। যেসব গুনাহতে অন্যান্য মহিলা লিপ্ত রয়েছে অথবা খুব সহজেই তাতে লিপ্ত হতে পারে।

মুসলমান মহিলা চিন্তাও করতে পারে না যে, সে নিজের নিষ্পাপ শিশুকে নিজের হাতে হত্যা করে ফেলবে। ইসলাম এ মারাত্মক পাপ নির্মূল করার জন্য একদিকে মাতা-পিতার অন্তরে মানব জীবনের মর্যাদার গভীর অনুভূতি এবং সন্তানের কদর ও মূল্য সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সন্তান হত্যাকে এতো সঙ্গীন পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যে, তাকে শিরকের মতো জঘন্য গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ

اِحْسَانًا وَّلاَ تَقْتُلُوْاۤ اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ ط ـ الانعام : ١٥١

"(হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন যে, এসো আমি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। তার সাথে

কাউকে শরীক করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করো ও দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভয়ানক যুলুম থেকে সমাজকে পবিত্র করার উপর এতো গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন যে, বাইয়াতে আকাবাতে তিনি সর্বপ্রথম আনসারদের নিকট থেকে যেসব জরুরী বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিলো, তারা যেন সন্তানদেরকে হত্যা না করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যেসব মহিলা হাজির হতেন তাদের নিকট থেকেও তিনি সন্তান হত্যা না করার ওয়াদা নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিলো তার এক দফায় সন্তান হত্যা না করার ওয়াদা সন্নিবেশিত ছিলো। ঈদের সাধারণ সমাবেশে তিনি মহিলাদের এলাকাতে তাশরিফ নিতেন এবং তাদের নিকট থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এ ব্যাপারেও ওয়াদা নিতেন।

"হযরত উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন সামেত বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমার নিকট একথার উপর বাইয়াত করো যে, তোমরা কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাবে না, চুরি করবে না, বদ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। যে ব্যক্তি এ ওয়াদা পূরণ করবে তার পারিশ্রমিক আল্লাহর জিম্মায়। আর যে ব্যক্তি তার মধ্য থেকে কোনো খারাপ কাজ করলো এবং তাকে আইনের অধীন শাস্তি প্রদান করা হলো তাহলে তা হবে তার গুনাহর কাফ্ফারা। আর যার গুনাহ্ দুনিয়াতে কারোর উপর প্রকাশ পেলো না তাহলে আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন।"

### সন্তান হত্যার কারণসমূহ

প্রাক ইসলামী যুগে অনেক দেশেই সন্তান হত্যার প্রচলন ছিলো। রোমে এর প্রচলন ছিলো বেশী। প্রকাশ্যভাবে সন্তানকে হত্যা করা হতো। এর কোনো বিচার বিশ্লেষণ হতো না। ভারতের রাজপূতদের মধ্যে এ ভয়ানক প্রথা চালু ছিলো এবং আরববাসীদের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী তো কিংবদন্তী হয়ে আছে।

সাধারণত সন্তান হত্যার তিনটি কারণ ছিলো। কিছু নাদান বা আহাম্মক তো একে একটি ধর্মীয় কাজ বলে মনে করতো এবং দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাদের সমীপে নিজের শিশুকে কুরবানী পেশ করতো। মানত মানতো যে, যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায় তাহলে আমার শিশুকে কুরবানী করবো। এ যুলুম ও নৃশংসতামূলক কাজ শুধু পুরুষরাই করতো না বরং মহিলারাও নির্দয়তার সাথে এতে শরীক হতো। একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একজন মহিলা এসে বললো, "আমি মানত মেনেছিলাম যে, নিজের শিশুকে কুরবানী করবো ? তিনি জবাবে বললেন, কখনো এ কাজ করো না। মানতের কাফ্ফারা আদায় করে দিও।"–মুয়াত্তা ইমাম মালেক

অজ্ঞতা এবং নৃশংসতার এ প্রথা অতীতের স্মরণীয় ব্যাপারই নয় বরং এ উপমহাদেশের কিছু মানুষ বর্তমানেও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ওযারান নামক স্থানে ৯ বছরের একটি নিষ্পাপ কন্যাকে দেবীর নামে হত্যা করা হয়।

পবিত্র কুরআনেও তাদের নাদানী এবং যুলুমের চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তারা সরাসরি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ

وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ○

"এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহুসংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের দীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৩৭

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ الانعام : ١٤٠

"নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব মানুষ যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৪০

কিছু কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার রুজীতে অংশ নিয়ে তাকে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করবে এ ভয়ে নিজের প্রিয় সন্তানকে হত্যা করতো। এসব নাদানকে এ যুলুম থেকে বাধা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা কি

নিজেদের রুজী স্বয়ং তৈরি করো ? যে আল্লাহ তোমাদেরকে রুজী দিয়ে থাকেন সে আল্লাহই তাদেরকে রুজী দেবেন। আল্লাহ যে প্রাণ দুনিয়ায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন তার রুজীর সরঞ্জাম তার সাথেই প্রেরণ করেন। রিযিকের কোষাগারের চাবি শুধু আল্লাহর হাতেই থাকে।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ (بنى اسراء يل : ٣١)

"দারিদ্রতার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকেও রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। প্রকৃত ব্যাপার হলো সন্তান হত্যা করা মহাপাপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অপরাধকে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اِنَّ ذَالِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ صحيح بخارى كتاب التفسير

"হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মাসউদ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, তোমরা কাউকে আল্লাহর শরীক করো না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, বাস্তবিকই এটা বড়ো গুনাহ এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, তোমাদের রুজীতে অংশ নেবে এ ভয়ে নিজের শিশুকে তোমরা যদি হত্যা করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ গুনাহ ? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে বদ কাজ করা।"

সন্তান হত্যার তৃতীয় পদ্ধতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দুঃখজনক। এ পদ্ধতির কথা চিন্তা করলেই অন্তর কেঁপে উঠে। কিছু কঠোর হৃদয় এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তির নিজের নিষ্পাপ প্রিয় কন্যাকে স্বহস্তে জীবিত দাফন করে দিতো। এ ভয়াবহ দৃশ্য এবং নিষ্পাপ পূতপবিত্র কন্যার আহ্! মূলক

ফরিয়াদ তাদের উপর সামান্যতম প্রভাবও ফেলতো না। তাদের নিকট কন্যার অস্তিত্ব জিল্লতী এবং অমর্যাদার প্রতীক বলে বিবেচিত। যে মহিলা অন্যের স্ত্রী হবে, সে তাকে পিতা বলবে এটা ছিলো তাদের নিকট অকল্পনীয় অমর্যাদার ব্যাপার। তাদের নিকট এটাও ছিলো অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার যে, তাদের জামাই হবে এবং জামাইরা তাদেরকে শ্বশুর বলবে। বস্তুত তারা যখনই অবহিত হতো যে তাদের ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে তখনই দুশ্চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে উঠতো। চেষ্টা করতো অবিলম্বে জিল্লতীর সে বস্তুর উপর কয়েক ডালি মাটি নিক্ষেপ করার। কারোর শ্বশুর এবং কন্যার স্বামী হওয়া তারা ভয়ানকভাবে অপসন্দ করতো। পবিত্র কুরআনে তাদের এ নিন্দনীয় চিন্তার চিত্র এভাবে অংকন করা হয়েছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط —

"যখন তাদের কারো কন্যা সন্তান পয়দা হবার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে। লোকদের নিকট থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরে, এ খারাপ খবরের পর কেমন করে কাউকে মুখ দেখাব। সে চিন্তা করে যে, লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে ?"—সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯

আরবের কতিপয় গোত্র এবং ব্যক্তি এ নিষ্ঠুরতা ও কঠোর হৃদয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। এ যালেমরা অসহায় ও নিষ্পাপ কন্যাদেরকে জীবিত দাফন করাকে অত্যন্ত কৃতিত্বের কাজ বলে মনে করতো। এ নির্দয়রা তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য গৌরবও করতো। এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের কৃতিত্ব বর্ণনা করে বললো সে তো স্বহস্তে আটটি কন্যা জীবিত দাফন করেছে।

### নিষ্পাপ কন্যার হৃদয় বিদারক ঘটনা

বনু তামিম গোত্রে কন্যা জীবিত দাফন করার নির্যাতনমূলক প্রথা একটু বেশীই ছিলো। এ গোত্রের সরদার কায়েস বিন আছেম যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তিনি নিজের নিষ্পাপ কন্যাকে স্বহস্তে জীবন্ত দাফন করার হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনিয়ে বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি সফরে বাইরে গিয়েছিলাম। এ সময় আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিলো। আমি বাড়ী থাকলে কণ্ঠস্বর শুনতেই তাকে মাটিতে পুঁতে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতাম। তার মা যেমন তেমন করে কিছুদিন পাললো। কিছুদিন লালন-পালনের জন্য মায়ের মমতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। পিতা তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার এ ধারণায় সে কম্পিত হলো। বস্তুত আমার ভয়ে ভীত হয়ে সে নিজের প্রিয় কন্যাকে তার খালার নিকট পাঠিয়ে দিলো। ধারণা ছিলো যে, সে সেখানে লালিত-পালিত হয়ে যখন বড়ো হবে তখন পিতার অন্তরেও দয়ার উদ্রেক হবে। আমি যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরলাম তখন জানতে পেলাম যে, আমার গৃহে মৃত শিশু জন্ম নিয়েছিলো। এভাবেই ঘটনার ইতি ঘটলো। কন্যা খালার কাছে লালিত-পালিত হতে থাকলো। এমনকি সে বেশ বড়ো হলো। আল্লাহর ইচ্ছা, কোনো প্রয়োজনে আমি একদিন বাইরে গেলাম। মা মনে করলো, আজ মেয়ের পিতা বাড়ী নেই। অতএব কন্যাকে বাড়ী নিয়ে আসলে কি অসুবিধা ? সুতরাং সে কন্যাকে বাড়ী নিয়ে এলো। দুর্ভাগ্য, কিছুদিন পর আমিও বাড়ী পৌছে গেলাম। পৌছে দেখি একটি অনিন্দ সুন্দর শিশু কন্যা বাড়ীর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দৌড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। আমার অন্তরেও এক অজ্ঞাত ভালোবাসা উথলে উঠলো। স্ত্রীও আমার দৃষ্টির অবস্থা দেখে আঁচ করে নিলো যে, সুপ্ত পিতৃস্নেহ জেগে উঠেছে এবং রক্তের প্রভাব রং নিয়েছে। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, নেক বখত ! এটা কার বাচ্চা ? অত্যন্ত সুন্দর মেয়ে তো !

এ প্রশ্নের জবাবে স্ত্রী সব কাহিনী শুনিয়ে দিলো। আমি অবলীলাক্রমে মেয়েকে গলায় জড়িয়ে নিলাম। মা তাকে বললো, এ তোমার পিতা। মেয়ে আমাকে ঝাপটে ধরলো। পিতার স্নেহ পেয়ে সে এতো আনন্দিত হলো যে, আব্বা আব্বা বলে সে মুখে মুখ লাগাতো এবং যখন সে আব্বা আব্বা বলে দৌড়ে আমার নিকট আসতো তখন আমি তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য ধরনের শান্তি অনুভব করতাম।

এভাবেই দিন যেতে লাগলো এবং কন্যা স্নেহ-ভালোবাসায় নির্ভাবনায় লালিত-পালিত হতে লাগলো। কিন্তু তাকে দেখে দেখে কখনো কখনো আমি চিন্তা করতাম, তার কারণে আমাকে শ্বশুর হতে হবে। আমাকে এ জিল্লতী বা অবমাননাও সহ্য করতে হবে যে, আমার কন্য কারো বৌ বা স্ত্রী হবে। আমি জনসমক্ষে কি করে মুখ দেখাবো। আমার মান-ইজ্জততো মাটিতে মিশে যাবে। অবশেষে আমার মর্যাদাবোধ আমাকে উচ্চকিত করে তুললো। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ

অবমাননাকর বস্তু দাফন করেই ছাড়বো। স্ত্রীকে বললাম, কন্যাকে তৈরি করে দাও। তাকে এক দাওয়াতে সাথে করে নিয়ে যাবো। স্ত্রী তাকে গোসল করালো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরালো এবং সাজিয়ে-গুজিয়ে তৈরি করে দিলো। শিশু কন্যাও বাপের সাথে বেড়াতে যাবার আনন্দে টুইটম্বুর। আমি তাকে নিয়ে এক নির্জন জঙ্গলের দিকে রওয়ানা দিলাম। কন্যা মনের আনন্দে নাচতে নাচতে আমার সাথে যাচ্ছিল এবং আমার পাষাণ মনে তখন একই ভাবনা যে, কতো তাড়াতাড়ি এ লজ্জার পুটলীকে মাটিতে পুঁতে ফেলা যায়। তারতো কিছু জানা ছিলো না, নিষ্পাপ কন্যা কখনো আমার হাত ধরে কখনো আমার থেকে আগে দৌড়ে, কখনো আনন্দে আত্মহারা হয়ে কথা বলতে বলতে যেতে লাগলো। অবশেষে আমি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেলাম। অতপর সেখানে গর্ত খোঁড়া শুরু করলাম। শিশু কন্যাতো হয়রান হয়ে গেলো যে, আব্বাজান নির্জন জঙ্গলে গর্ত কেন খুঁড়ছেন এবং জিজ্ঞেস করলো, আব্বা গর্ত কেন খুঁড়ছো। সেতো জানতো না যে, নিষ্ঠুর পিতা তার জন্যই কবর খুঁড়ছে এবং চিরদিনের জন্য তাকে স্তব্ধ করে দেবে। গর্ত খুঁড়ার সময় যখন আমার পা ও কাপড়ের উপর মাটি পড়লো তখন নিষ্পাপ কন্যা নিজের ছোট ছোট ও প্রিয় নাজুক হাত দিয়ে মাটি ঝেড়ে দিলো এবং তোতলা ভাষায় বললো আব্বু তোমার কাপড় নষ্ট হচ্ছে। আমি যখন গভীর গর্ত খোঁড়া শেষ করলাম তখন সে পুতপবিত্র নিষ্পাপ ও হাসিখুশী কন্যাকে উঠিয়ে সে গর্তে নিক্ষেপ করলাম এবং অতি তাড়াতাড়ি করে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। কন্যাটি আমার দিকে বেদনার্ত হয়ে তাকিয়ে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, আব্বাজান, আমার আব্বাজান, এ তুমি কি করছো ? আব্বু, তুমি কি করছো? আব্বু আমিতো কিছু করিনি। আব্বু, তুমি কেন আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলছো ? এবং আমি বোবা, অন্ধ এবং কালা হিসেবে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার যালেম ও পাষাণ হৃদয়ে কোনো দয়া মায়ার উদ্রেক হলো না এবং কন্যাকে জীবিত দাফন করে আরামের নিশ্বাস টানতে টানতে ফিরে এলাম।

নিষ্পাপ কন্যার উপর এ নির্যাতন এবং তার অসহায়ত্বের বেদনা-বিধুর কাহিনী শুনে রহমাতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর দুঃখে বেদনার্ত হয়ে গেলো। তাঁর পবিত্র চক্ষু দিয়ে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগলো। তিনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, "এটা চরম পাষাণ হৃদয়ের কাজ। যে মানুষ অন্যের উপর দয়া প্রদর্শন করতে পারে না, আল্লাহ তার উপর কি করে রহম করবে ?"

**শিক্ষণীয় কাহিনী**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি নিজের জাহেলী যুগের এক কাহিনী শুনালো এবং তার চিত্র এমনভাবে পেশ করলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদনা বিদুর হয়ে গেলেন।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা অজ্ঞ ছিলাম। আমাদের কোনো খবর ছিলো না। পাথরের মূর্তি পূজা করতাম এবং নিজের প্রিয় সন্তানকে নিজের হাতে মৃত্যুর কুলে নিক্ষেপ করতাম। হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি অত্যন্ত স্নেহের কন্যা ছিলো। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম তখনই সে দৌঢ়ে আমার নিকট আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। সে খুশীতে টগবগ করতে করতে দৌঁড়ে আমার নিকট এলো। আমি তাকে সাথে নিয়ে চললাম। আমি আগে আগে চললাম। আর সে পিছে পিছে দৌঁড়ে আসতে লাগলো। আমার গৃহ থেকে সামান্য দূরে একটি গভীর কূপ ছিলো। আমি সে কূপের নিকট পৌঁছে থেমে গেলাম। মেয়েটিও আমার নিকটে এসে গেলো। অতপর হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মেয়েটির হাত ধরে উঠিয়ে সে কূপে নিক্ষেপ করলাম। নিস্পাপ মেয়ে কূপের ভেতরে চেঁচাতে লাগলো এবং অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে আমাকে আব্বা আব্বা বলে ডাকতে লাগলো। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! জীবনের সর্বশেষ আওয়াজ তার এটিই ছিলো।"

এ দরদভরা কাহিনী শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর বেদনাপ্লুত হয়ে পড়লো এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এক সাহাবী তাকে গাল-মন্দ দিলেন এবং বললেন, তুমি অহেতুক এ দুঃখজনক কাহিনী শুনিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যথা দিয়েছো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, না তাকে কিছু বলো না। তাকে কিছু বলো না। তার উপর যে মুসিবত অর্পিত হয়েছে তার প্রতিবিধান শুনতে সে এসেছে। অতপর তাকেই সম্বোধন করে বললেন, তুমি পুনরায় তোমার কাহিনী শুনাও। সাহাবী দ্বিতীয়বার সে দুঃখভরা কাহিনী শুনালেন। কাহিনী শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হলো। ক্রন্দন করতে করতে তাঁর দাড়ি মোবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। অতপর তিনি তাঁকে বললেন, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো এর বরকতে জাহেলী যুগের সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেছে ? যাও এখন ভালো কাজ করো।"–মুসনাদে দারেমী

কত নিষ্পাপ এবং অসহায় মেয়ে এ যুলুমের শিকার হয়েছে এবং কতদিন যাবত মেয়েরা নিজেরা মাতা-পিতার হাতে জীবিত দাফন হয়েছে

তা আল্লাহই ভালো জানেন। যদিও সে যুগেও কিছু রহম দিল এবং আল্লাহ প্রেমিক মানুষ অবশ্যই ছিলেন। তারা মেয়েদেরকে এ যুলুম ও বর্বরতার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের এ ব্যক্তিগত চেষ্টা সে ভয়াবহ প্রথা খতম করতে পারেনি।

## মেয়েদেরকে জীবন্ত দাফন থেকে বাঁচানোর শুভ চেষ্টা

ফারাযদাক আরবের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। একটি ব্যাপারে তাঁর বড়ো অহংকার ছিলো। তাঁর দাদা হযরত ছা' ছা' কত মেয়েকেই না জীবন্ত দাফন হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত ছা' ছা' নিজেই নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ

"একবার আমি আমার দুটি নিখোঁজ উটের সন্ধানে বের হলাম। দূরে আগুন নজরে এলো। কখনো আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠতো আবার কখনো তা নিভে যেতো। আমি চিন্তা করলাম গিয়েই দেখি না ঘটনা কি। সম্ভবত কোনো মুসিবতে পতিত মানুষ এ আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আমি রওয়ানা দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কোনো মুসিবত পতিত লোক হলে এবং তার উপকারে আসলে অবশ্যই তার বিপদ দূর করার চেষ্টা চালাবো। কিন্তু আমি দ্রুত উট চালালাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বনী আনমারের মহল্লায় পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি, লম্বা চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ নিজের গৃহের সামনে বসে শোক প্রকাশ করছে এবং অনেক মহিলা একজন মহিলাকে ঘিরে বসে আছে। এ মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। সালাম ও দোয়ার পর পরিস্থিতি জানতে চাইলে তারা আমাকে জানালো যে, তিনদিন যাবত মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতর। বড়ো মিয়ার সাথে একথা হচ্ছিল এমন সময় মহিলারা বলে উঠলো বাচ্চা জন্ম নিয়েছে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলো, পুত্র হলে ভালো। আর যদি কন্যা হয় তাহলে তার আওয়াজ শ্রবণ করতে চাই না। এক্ষণই তাকে হত্যা করবো। আমি অত্যন্ত মিষ্টিভাবে বললাম শেখ ! এটা করবেন না। আপনারই কন্যা। বলো, রুজীর প্রশ্ন। তার রুজীদাতা হলেন আল্লাহ। বৃদ্ধ পুনরায় গর্জে উঠলো। না, তাকে জীবিত রাখবো না। তাকে হত্যা করেই ছাড়বো। আমি বিনয়ের সাথে পুনরায় পীড়াপীড়ি করায় তার ভেতর কিছুটা পরিবর্তন ঘটলো এবং বললো, তুমি যদি এতোই রহমদিল হও তাহলে তার মূল্য দাও এবং নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করো। নির্দ্বিধায় বললাম, আমি ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছি এবং নবজাত কন্যাকে ক্রয় করে খুশীর সাথে ফিরে এলাম এবং আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম যে, এ শিশু কন্যাকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পালন করবো। আমি আল্লাহর সাথে এ

ওয়াদাও করলাম যে, যখনই কোনো পাষাণ হৃদয় কোনো নিষ্পাপ কন্যাকে হত্যা করতে চাইবে আমি কখনই তা করতে দিবো না। দাম দিয়ে সে কন্যা নিয়ে আসবো এবং অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালন-পালন করবো। অতপর এ সিলসিলা অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করলেন। সে সময় পর্যন্ত, আমি ৯৪জন শিশু কন্যাকে যালেম পিতা-মাতাদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছিলাম। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিশাপ চিরদিনের জন্য শেষ করে দেন।"

ইসলাম সন্তান হত্যার সকল নির্যাতনমূলক প্রথা থেকে সমাজকে পবিত্র করে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার পরিচিত হিসেবে উল্লেখ করে যে, সে আল্লাহর নিকট সন্তানকে চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করে থাকে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ ـ الفرقان : ٧٤

"এবং (আল্লাহর বান্দা) সে বলে থাকে যে, হে আমার প্রভু! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪

# কন্যার জন্ম

আপনার গৃহে কন্যা জন্ম নিক অথবা পুত্র। আপনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এতে আপনি খুশী প্রকাশ করবেন। শুধু আনন্দ প্রকাশই নয় বরং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনও আপনার আনন্দে শরীক হোক তাও চান। আর এটাই হয়ে থাকে। ইসলাম আপনাকে যে আলোকবর্তিকা দেখিয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল আপনার সামনে রয়েছে, তা থাকতে আপনি পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্য করার চিন্তাই করতে পারেন না। পুত্রের জন্মে খুশী প্রকাশ করবেন এবং কন্যার জন্মে তা করবেন না। কন্যার অস্তিত্ব অমর্যাদাকর মনে করা। পুত্রকে কন্যার উপর অগ্রাধিকার দান ইসলাম বিরোধী চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি। এ ধ্যান-ধারণা থেকে ইসলামী সমাজকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। ইসলামী সমাজ অবশ্য এ ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত রয়েছেও।

কিন্তু তবুও কিছু পরিবার এমন পাওয়া যায় যেখানে পুত্র ও কন্যা জন্মের সময় একই ধরনের পরিবেশ পাওয়া যায় না। পুত্রের জন্মগ্রহণে যেভাবে আন্তরিকতার সাথে আনন্দ প্রকাশ করা হয় কন্যার প্রশ্নে তা করা হয় না। পুত্র জন্মের সুসংবাদ যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে প্রদান করা হয়, কন্যা জন্মের খবর সে উচ্ছ্বাসের সাথে দেয়া হয় না। যেমন পুত্রের জন্মে দেয়া হয়। কন্যা জন্মের মুবারকবাদ অনেকটা ধৈর্য ধারণের উপদেশের মতো হয়।

আপনিই বলুন এ সকল বাক্যের অর্থ কি দাঁড়াবে ঃ আমার কোমর তো ভেঙ্গে গেছে। আমি খাড়া বসে গেছি। অন্তরের সাধতো অন্তরেই রয়ে গেলো। ওকেও কোলে নিই। কিন্তু পুত্রের কথা আলাদা। আমার মাথা হেট হয়ে গেছে। কন্যা ওয়ালারা তো মাথাই তুলতে পারে না। ঠিক আছে ভাই, আল্লাহর ইচ্ছায় আর কার দখল থাকতে পারে। আল্লাহ ভাগ্য ভালো করুক। আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন। তিনিই সাহস দেবেন। কন্যাকেও স্নেহ করি, কিন্তু বড় নিরানন্দ মনে। পুত্র হলে সাধই হতো ভিন্ন ধরনের। আপনাকে খবর দিইনি। কারণ, কি আর খবর দিবো। তাই হয়েছে যা সবসময়ই হয়। এজন্য কি লিখবো ............।" আল্লাহ ক্ষমা করুন। আপনি বলুন, এ সকল বাক্যের সাথে ইসলামী শিক্ষার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? কিন্তু চেতন এবং অবচেতন উভয়ভাবেই কিছু মুসলমান পরিবারে এ সকল কথা দোহরানো হয়ে থাকে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই এর পুনরাবৃত্তি করেন।

সন্তানের প্রশ্নটি সোজা আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন ব্যাপার। এতে কারোর ইচ্ছা বা সাধ-আহলাদের কোনো দখল নেই। আর এটাও আল্লাহই ভালো জানেন যে, কার ব্যাপারে কন্যা ভালো এবং কার ব্যাপারে পুত্র। আপনি এ দোয়া এবং আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই করতে পারেন যে, আপনার কন্যা হোক, পুত্র না হোক অথবা পুত্র হোক, কন্যা না হোক। কিন্তু এটা আবশ্যক নয় যে, আপনার আকাঙ্ক্ষাই পূরণ এবং দোয়া কবুল হবে। এ ফায়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কারোর এমন শক্তি নেই যে, তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেবে। অথবা তাঁকে প্রভাবিত করবে। তাঁর কুদরত এবং ইখতিয়ারে কেউই অংশীদার নয়।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ط وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ـ شورى : ٤٩ـ٥٠

“তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা-মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী।”

বাস্তব কথা হলো, সন্তানের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায়। যদি সে এ ব্যাপারেই চিন্তা করে তাহলে দেখতে পাবে যে, সৃষ্টিজগতে শুধুমাত্র এক আল্লাহর নির্দেশ চলছে এবং তাঁর ইলাহিয়াতে অন্য কারোর অংশীদারিত্ব নেই। সন্তানের প্রশ্নে কারোর বুযুরগী এবং কারামত কাজ দেয় না। তাবিজ-তুমার এবং চিকিৎসাতেও কোনো কাজ হয় না। অন্যকে সন্তান দান অথবা কন্যার পরিবর্তে পুত্র জন্ম দেয়ানো তো দূরের কথা অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও নিজের গৃহে নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতে পারে না। আর যদি সে সন্তান থেকে মাহরূম হয় তাহলে নিজের চেষ্টায় একটি সন্তান পাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কোনো জ্ঞানের মাধ্যমে এও আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, কন্যাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না পুত্র। এমনও দেখা যায় যে, কোনো গৃহে শুধু কন্যা আর কন্যা এবং সে গৃহে কল্যাণ এবং শান্তি পরিপূর্ণ। আবার কোনো গৃহে শুধু পুত্র আর পুত্র। কিন্তু প্রত্যেকেই মাতা-পিতার জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে রয়েছে। এমনও দেখা যায় যে, কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়ার পর মা দিন-রাত মেয়ের জন্য দোয়া করছে, কিন্তু যখনই আল্লাহ কন্যা দান করেন তখনই বলা হয় যে, মাতা-পিতার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে এবং মা এ বদদোয়া করতে বাধ্য হয়

যে, হায় ! জন্মের সময়ই যদি মরে যেতাম তাহলে কতোই না ভালো হতো। আবার এমনো আছে যে, মাতা-পিতা পুত্রের কথা সহ্যই করতে পারে না এবং কন্যা তাদের এতো প্রিয় যে, সবসময় তার গুণ গায়। প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহই গায়েব সম্পর্কে অবহিত এবং মানুষের সৌভাগ্য এবং কল্যাণ কিসে আসবে তাও তিনিই জানেন।

## কন্যা সৌভাগ্যের কারণ হলো

ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন যে, হে পরওয়ারদিগার ! আমি আমার ভূমিষ্ঠতব্য সন্তানকে তোমার দরবারে মানত করেছি। তুমি আমার মানত কবুল করো। কিন্তু যখন তার কন্যা সন্তান জন্ম নিলো তখন খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো এবং বললো, পরওয়ারদিগার ! এতো কন্যা। হায় আল্লাহ! এ কন্যা দিয়ে সে লক্ষ্য কি করে পূরণ হবে। পুত্র তো কন্যার মতো হয় না। পুত্র তো প্রাকৃতিক দুর্বলতা এবং তামাদ্দুনিক বাধ্য বাধকতা থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, ইমরানের বেগম কাকে জন্ম দিয়েছে। সে তাকে কন্যা মনে করে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে। সে মনে করছে যে, সে লক্ষ্য কি করে পূরণ হবে, যে জন্য সে সন্তানকে মানত করতে চেয়েছিলো। সেকি জানতো যে, এ কন্যাই তার জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে এবং এ কন্যাই কিয়ামত পর্যন্ত তার নাম আলোকিত করে রাখবে ? তার বদৌলতেই ইমরানের বেগমের নাম সর্বশেষ আসমানী কিতাবে সংরক্ষিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ তাঁর নাম স্মরণ করবে এবং তার বদৌলতেই সে এমন এক নেতৃস্থানীয় পয়গাম্বরের নানী হবেন যাঁর উপর আল্লাহ ইনজিল কিতাব নাযিল করবেন।

বস্তুত ইমরানের স্ত্রীর মানত আল্লাহ পাক ব্যর্থ করেননি। বরং সে কন্যাকে আল্লাহ এমন সুন্দরভাবে কবুল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করা হবে। তার নাম সহিফায় সংরক্ষিত রয়েছে। যা পড়া সাওয়াব। শুনা সাওয়াব এবং শুনানোও সাওয়াব। পবিত্র কুরআনে সে কাহিনীও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ
عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ؕ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ ال عمران : ٣٧

"শেষ পর্যন্ত তার আল্লাহ্ এ কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন, যাকারিয়া যখন তার নিকট মেহরাবে যেতো তখনই তাঁর নিকট কিছু না কিছু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য দেখতে পেতো। জিজ্ঞেস করতো ঃ মরিয়ম, এ তুমি কোথায় পেলে ? উত্তর দিতো, এ আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপুল পরিমাণ রিযেক দান করেন।"

সন্তান আল্লাহর দান। কন্যাও তারই দান এবং পুত্রও। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মুমিনের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মুমিনের কর্তব্য।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন মহিলার আকীদা বা বিশ্বাস হলো, তাঁর থেকে উত্তম বা আফজাল কেউই সৃষ্টি হয়নি এবং হতেও পারে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার কন্যার পিতা ছিলেন। হযরত খাদিজা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আসমান ও জমিনে তাঁর থেকে উত্তম কোনো মহিলা নেই। তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ চার কন্যা দান করেছিলেন এবং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সে চার কন্যার মাতা ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে হেদায়াত করেছেন ঃ

لَاتَكْرِهُوْ الْبَنَاتِ فَانِّىْ اَبُوْ الْبَنَاتِ ـ

"কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।"

এছাড়াও তিনি বলেছেন, কন্যারা অত্যন্ত মুহাব্বাতওয়ালী এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়।–কানযুল উম্মাল

হযরত ইবনে শুরায়েত বলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلٰئِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا

بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - المعجم الصغير اللطبرانى

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা! তোমাদের উপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।"–আল মুয়াজ্জামুস সাগির লিত তিবরানী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তি বসেছিলো। লোকটির কয়েকটি মেয়ে ছিলো। সে বললো, হায় ! এসব মেয়ে যদি মরে যেতো তাহলে কতোই না ভালো হতো। আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং তাকে বললেন, "তুমি কি তাদের রিযিক দাও।"

কন্যা সন্তান জন্মের ফলে ভ্রু কুঁচকানো এবং নিরানন্দ হওয়ার মৌলিক দুটি কারণই থাকতে পারে। প্রথমত কন্যার অস্তিত্বই লজ্জার কারণ মনে করা এবং দ্বিতীয়ত তার পেছনে খরচ-পত্রের ব্যাপারে ঘাবড়ে যাওয়া।

প্রথম কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কারণ যে মহিলা ইসলামের আলোকে জীবন অতিবাহিত করতে চায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনকে নিজের জন্য আদর্শ মনে করে। তাহলে এটা কি করে লজ্জার ব্যাপার হতে পারে যেখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কন্যার পিতা ছিলেন এবং তিনি কন্যার অস্তিত্বকে জাহান্নামের ঢাল ও জান্নাতের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ ধরনের জাহেলী ধ্যান-ধারণা মুহূর্তের জন্যও একজন মুসলমানের মনে আসতে পারে না। আল্লাহকে রিযিকদাতা এবং রুজি প্রদানকারী হিসেবে বিশ্বাসকারী কি করে ধারণা করতে পারে যে, কন্যার রিযিকদাতা সে। আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি

ঈমান পোষণকারীর আকীদাই হলো রিযিকদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ এবং প্রতিটি সৃষ্ট জীবকে আল্লাহই রুজী সরবরাহ করেন। সে নিজের অংশের রুজী সাথে করেই নিয়ে আসে। কোনো মানুষের এ ধরনের চিন্তা করার কি অধিকার আছে যে, সে কারোর রুজি সরবরাহ করে। তাকেই যখন আল্লাহ রিযিক দান করেন এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কার ভাগ্যে কি আছে কিছুই বলা যায় না। হতে পারে জন্মগ্রহণকারী দুর্বল কন্যা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মহান ভাগ্য নিয়ে এসেছে। এটাও আল্লাহর কুদরাতের বাইরে নয় যে, আপনার গৃহে জন্মগ্রহণকারী দুর্বল মেয়ে শুধুমাত্র নিজের রুজীই নিয়ে আসেনি, বরং সে নিজের ভাগ্যের বদৌলতে আপনার দিনও ফিরিয়ে দিতে পারে।

দুর্বল কন্যার অভিভাবক বানিয়ে আল্লাহ আপনার উপর বিরাট ইহসান করেছেন। ইহসানও এমন ইহসান যে, চিন্তা করলে আপনি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে যাবেন। যে জান্নাতকে আল্লাহ পাক কঠিন ক্লেশ ও বিপদ সংকুল পথ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, কন্যার মাতা-পিতা হওয়ার কারণে সে জান্নাতের পথ আপনার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে।

# সন্তান প্রতিপালন

সন্তানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তাদের লালন-পালন। সন্তান অস্তিত্বের জন্য যেমন মাতা-পিতার মুখাপেক্ষী তেমনি বৃদ্ধি ও লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্যও মাতা-পিতার মুখাপেক্ষী। শিশুর শৈশবকাল অত্যন্ত অসহায়ত্বের কাল। এ সময় যদি মাতা-পিতার অভিভাবকত্ব ও লালন-পালনের সুযোগ না পায় তাহলে সে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এজন্য ইসলাম সন্তানের কদর ও মূল্য বর্ণনার পর তাকে ভালোভাবে লালন পালনের দ্বিতীয় অধিকার বর্ণনা করেছে।

### মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহর ইহসান

সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য সীমাহীন ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা প্রয়োজন। আল্লাহ্ পাক মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি অসীম ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং তার প্রতিপালনের শক্তিশালী ইচ্ছা দিয়ে এ কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে দিয়েছেন। সন্তান প্রতিপালনকালে বিভিন্নমুখী কষ্ট সহ্য করে মাতা-পিতা কখনই বিতৃষ্ণ ভাব পোষণ করে না বরং এ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অন্তরে অন্তরে শান্তি অনুভব করেন। দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে এবং বিভিন্ন ধরনের দুঃখ সয়ে যখন শিশুর দিকে একবার স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন গৌরব ও খুশীর বান ডাকে। মাতা-পিতার অন্তরে এমন আত্মিক আনন্দ ও খুশীর উদ্ভব হয় যে, প্রতিপালনের শত দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি আর অবশিষ্ট থাকে না। শিশুর প্রতি এ অসাধারণ আন্তরিক স্নেহ দিয়ে আল্লাহ্ পাক মাতা-পিতার প্রতি বড্ড ইহসান করেছেন। এ আবেগ ও উচ্ছ্বাস যদি না হতো তাহলে সম্ভবত সন্তান প্রতিপালনের অধিকার আদায় করা মাতা-পিতার জন্য এক বিরাট পরীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো এবং খুব কমসংখ্যক লোকই এ দুঃখ-কষ্টের কর্তব্য পালনে সক্ষম হতো।

সে দুর্বল ও পরিশ্রান্ত মায়ের কথা চিন্তা করুন যিনি নির্দিষ্ট কয়েক মাস নিজের শরীর ও জীবনী শক্তি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে একটি শিশুর অস্তিত্বের শক্তি দান করেন অতপর নিজের জীবনকে বাজি রেখে একটি নবজাতকের জন্ম দেয়। সেই নবজাতকের কথাই চিন্তা করুন। গোশতের একটি অসহায় টুকরা। না তার আছে কথা বলার শক্তি। আর সে অসুস্থ মা নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে তার প্রতিপালনের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে থাকেন।

শিশুর অব্যাহত ক্রন্দনে সে সামান্যতম অস্বস্তিও অনুভব করে না। সে বার বার পেশাব-পায়খানা করে। শুধু বিছানাতেই নয় বরং প্রায়ই তাঁর শরীর ও কাপড়-চোপড়ে। কিন্তু তাতেও সে কিছু মনে করে না। উপরন্তু শিশুর যদি কোনো কষ্ট হয় তাহলে দুর্বল মা কোলে নিয়ে সারা রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করে। এতে সে সামান্যতম কষ্টও অনুভব করে না। বরং বাচ্চাকে কষ্টে দেখে এমনভাবে ছটফট করতে থাকে যে, সম্ভব হলে কষ্ট নিজের উপর নিয়ে শিশুকে আরামদানের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। এ অবস্থা পিতারও। পিতা ঘামের আয় এ তুলতুলে শিশুর জন্য খরচ করতে মোটেই দ্বিধা করেন না। তার জন্মের খুশী হোক অথবা আকীকার আনন্দ। সবসময়ই সে আনন্দে আনন্দে নিজের সম্পদ খরচ করে। শরীর ঝলসানো গরমে কষ্ট সহ্য করে, কঠিন লু হাওয়ার বারি খেয়ে, কাঠ ফাটানো রৌদ্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এবং রক্ত জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় সময়ে অসময়ে দৌড়-ঝাপ পেরে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে যা কিছু কামাই করে তা সন্তানদের জন্যই কামাই করে। অতপর তা সন্তানদের জন্য খরচ করে অন্তরে কষ্ট পায় না, বরং প্রচণ্ড আত্মিক শান্তি অনুভব করে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি সে শিশুর জন্য সীমাহীন স্নেহ-ভালোবাসা ও তার প্রতিপালনের প্রচণ্ড স্পৃহাই না থাকতো তাহলে এসব কেমন করে সম্ভব হতো।

## সন্তান প্রতিপালন একটি স্বভাবজাত প্রবণতা

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং তার প্রতিপালনের আবেগ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আল্লাহ পাক এ প্রবৃত্তি প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরেই সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতা মুসলমান হোক বা না হোক, কোনো ধর্ম বা আল্লাহতে বিশ্বাসী হোক বা না হোক, তাতে কোনো তারতম্য নেই।

মানব বংশের স্থায়ীত্ব এবং এ দুনিয়া আবাদ রাখার অতীব প্রয়োজনেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সন্তান প্রতিপালনের প্রবৃত্তি এবং স্পৃহা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এজন্য কোনো পার্থক্য ছাড়া প্রত্যেক মাতা-পিতাকে সহজাত আবেগ দান করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যেক মানুষের মনে সাধ জাগে যে, তারপর তার সন্তান তার স্থান দখল করুক। তার নাম জীবিত রাখুক। তার সহায়-সম্পদের উত্তরাধিকার হোক এবং তার ইতিহাস, তাহজীব এবং নিয়ম প্রথারও উত্তরাধিকার হোক। সন্তান নিজের শরীর এবং আত্মারই একটি অংশ। এজন্য প্রকৃতিগতভাবেই তার জীবন মাতা-পিতার নিকট প্রিয় হওয়া প্রয়োজন। যেসব মানুষ সন্তান প্রতিপালনের এবং তার আবেগ-অনুভূতির সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তারাও সহজাত স্নেহ-ভালোবাসার অধীন সন্তান প্রতিপালন উত্তম কর্তব্য

এবং ভালো কাজ হিসেবেই মনে করে। শিশুর খাতিরে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করা এবং অব্যাহত ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য একজন মহিলার এ বন্ধনই যথেষ্ট যে, সে শিশুর মা। সে ইসলামের উপর ঈমান আনুক অথবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাসী হোক অথবা কোনো ধর্ম সম্পূর্ণ নাই মানুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

### প্রতিপালনের প্রশ্নে মুসলমান মা'র পার্থক্য

সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ এবং তার প্রতিপালনের আবেগ অনুভূতি আল্লাহ্ পাক সকল মা-কেই দান করেছেন। মুসলমান মা এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মা উভয়েই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন সন্তান প্রতিপালন করে থাকে। কিন্তু উভয়ের ধ্যান-ধারণা, শ্রম দানের কারণ, কর্মপদ্ধতি এবং চেষ্টার প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করে অথবা চিন্তা করতে পারে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে তার দৃষ্টি অনন্ত জগত পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। নিজের সন্তান হওয়ার কারণে সে তার লালন-পালন করে। তার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ রয়েছে। সন্তান প্রতিপালন দুনিয়ায় একটি উত্তম কাজ এবং এ সহজাত আবেগের কারণেই সে তা করে।

সে এ চিন্তা করে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ টিকে থাকবে অথবা সন্তান বড়ো হয়ে তাকে আরাম ও শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বার্থক জীবন-যাপন করতে পারে।

মুসলমান মা-ও সন্তানের প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধের কারণে লালন-পালন করে থাকে। সন্তান তার বংশের স্থায়ীত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যম একথাও সে মনে করে। সে তার জীবনের সাহায্যকারী এবং বার্ধক্যকালীন আশ্রয় স্থল। কিন্তু পার্থক্য হলো যে, সে সন্তান প্রতিপালনকে একটি দীনি দায়িত্ব এবং আখেরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করে। উপরন্তু মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালনে নিজেকে ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন করে নেয়। সন্তানের জীবনের লক্ষ্য শুধু দুনিয়ার জীবনে সচ্ছলতা ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করার জন্য মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালন করে না বরং তারা নিজের অভিভাবকত্বে এমন মুজাহিদ তৈরি করে যাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হয় যারা দুনিয়া

আল্লাহর মর্জি মুতাবেক জীবন কাটানো এবং আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুনিয়ায় জীবিত থাকে এবং মারা যায়।

মুসলমান মাতার নিকট সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নটি শুধু পার্থিব দুনিয়ার ব্যাপারই নয়, বরং তার ভালো-মন্দের প্রভাব সে জীবনেও প্রতিভাত হবে যাকে পরকালীন জীবন বলা হয়। আর এ পরকালীন জীবনের উপর সে ঈমান রাখে। তার চিন্তার ধরন এ হয় যে, সে যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় গড়ে তোলে এবং ইসলামী নির্দেশ মুতাবেক লালন-পালন করে তাহলে তার পরকালীন জীবন সুন্দর হবে। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন এবং তাকে জান্নাত দান ও পুরস্কারের বারি বর্ষণ করবেন। যদি সে এ দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা দেখায় অথবা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে না তোলে তাহলে পরকালে লজ্জিত হবে এবং আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন।

মাতৃত্বের মমতায় বাধ্য হয়েও মুসলমান মাতা সন্তান প্রতিপালন করেন এবং এ দুনিয়াতেও তার ভালো প্রতিদান চান। কিন্তু সাথে সাথে তার বদলা ও প্রতিদানের সেদিনও প্রত্যাশী হবেন যেদিন এ দুনিয়ার তুলনায় প্রতিদানের বেশী মুখাপেক্ষী হবেন। সে প্রতিদান চিরস্থায়ী হবে।

যে মা ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত সে কখনো মুসলমান মায়ের মতো সন্তানের প্রতি ভালোবাসার আবেগ অনুভব করতে পারে না। সহজাত আবেগের সাথে সাথে যদি ঈমানী আবেগ যুক্ত হয় তাহলে স্নেহ ও আন্তরিকতার যে গভীরতা সৃষ্টি হয় তা অমুসলিম মায়ের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে না। উপরন্তু মুসলমান মা'র অন্তরে মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যে আনন্দ ও শক্তি সৃষ্টি হয় তা অমুসলিম মায়ের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে না।

এ ধরনের চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে বড় উপকারের দিক হলো যে, সকল প্রচেষ্টা ও কুরবানী সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম হয় তাহলেও সে মা লজ্জিত হন না। তিনি নিরাশও হন না এবং তার কাজেও ভাটা পড়ে না। বরং এ আস্থায় তিনি সবসময় বলীয়ান থাকেন যে, দুনিয়ায় যদি সন্তান তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহর নিকট যে বদলা ও প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূরণ করবেন। কেননা আল্লাহ কখনো বান্দাহর কাজের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তিনি বড়ো শক্তিশালী। তিনি বান্দাহর সুন্দর কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেন এবং কখনো বান্দাহকে প্রতিদান থেকে মাহরূম করেন না।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ○ الدهر : ٢٢

"এটা তোমাদের জন্য (তোমাদের প্রচেষ্টার) প্রতিদান এবং তোমাদের মেহমান এবং প্রচেষ্টা (আল্লাহর নিকট) কবুল হয় (বেকার হয়ে যায় না)।"–সূরা আদ দাহ্র ঃ ২২

আল্লাহর কুদরাতের অবস্থা হলো তিনি বান্দাহর নেক আমলে নিজের ফযিলত আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং প্রতিদান ও পুরস্কারকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে বান্দাহকে দান করেন। বান্দাহর আমলে যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয় তবুও তিনি প্রতিদানে কমতি না করে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দেন এবং নিজের ফযিলতের মাধ্যমে প্রতিদান বৃদ্ধি করেন।

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْلَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ الشورى : ٢٣

"যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে আমরা তার জন্য এ কল্যাণে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিবো। নিসন্দেহে আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।"–সূরা আশ শূরা ঃ ২৩

## সন্তান প্রতিপালনের অর্থ–দুটি দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার দায়িত্ব সমান এবং উভয়ে মিলেমিশেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সন্তান প্রতিপালনের অর্থ হলো দু ধরনের দায়িত্ব পালন করা।

**এক ঃ** শিশু লালন-পালনের খিদমত।

**দুই ঃ** শিশু প্রতিপালনে খরচের মাল প্রদান।

প্রথম দায়িত্বের অর্থ হলো শিশুদের প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং তাদের হিফাযত ও তত্ত্বাবধান করা। তাদের স্বাস্থ্য এবং আরামের ব্যবস্থা করা। যতদিন পর্যন্ত তারা খানাপিনার যোগ্য না হবে ততদিন তাদের এ খিদমত করতে হবে। মাতা শিশুকে নিজের দুধ খাওয়াবে এবং তত্ত্বাবধান করবে। দুধ ছাড়ানোর পরও বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধান, শারীরিক ও নৈতিক প্রয়োজনীয়তার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যাতে সে লালিত-পালিত হয়ে মানবীয় দায়িত্বানুভূতি লাভে সক্ষম হয় এবং তার পালনের যোগ্য হয়।

দ্বিতীয় দায়িত্বের অর্থ হলো, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের সকল খরচ বহন করতে হবে। তার খানাপিনা, পরিধান

এবং বাসস্থানের সকল ব্যয় ও তার খিদমত, শরীর-স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হবে।

### দায়িত্ব বন্টন

প্রথম দায়িত্ব অর্থাৎ শিশু প্রতিপালনের খিদমত যদিও মাতা-পিতার উভয়ের মধ্যে তবুও স্বাভাবিকভাবে এর বেশী বোঝা মায়ের উপরই বর্তায়। ইসলামও এ অধিকার মাকেই দান করেছে। এটাও মার দায়িত্ব যে, সে সাধারণ অবস্থায় দু বছর পর্যন্ত নিজের শিশুকে দুধ খাওয়াবে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্থাৎ ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব একক পিতার উপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ মাতাকে এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। কারণ সে যাতে সবসময় শিশুদের সাথে থেকে একাগ্রতার সাথে নিজের অংশের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আদায়ে সক্ষম হয়।

### শিশু প্রতিপালনে মা'র খিদমতই প্রকৃত কৃতিত্ব

মাতার প্রচেষ্টার প্রকৃত ক্ষেত্র হলো তার গৃহ এবং তার আসল কৃতিত্ব হলো শিশুর দেখাশোনা ও তার প্রতিপালনের সুন্দর সেবা দান। ইসলাম এ খিদমতই তার দায়িত্বে অর্পণ করেছে। এটাই তার সাফল্যের প্রকৃত ময়দান এবং এটাই তার আসল কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ـ بخارى، مسلم

"মহিলা স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং জিম্মাদার। যেসব ব্যক্তি ও বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক তাকে বানানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"–বুখারী ও মুসলিম

যখনই ও যেখানেই মহিলাকে তার প্রকৃত ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে বাইরের ময়দানে টেনে আনা হয়েছে এবং অস্বাভাবিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে সহজাত দায়িত্বের অতিরিক্ত বাইরের দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তখনই পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়েছে। বাইরের জীবনেও কিয়ামতের মতো বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং সন্তানের জীবনও বিরাণ ও বরবাদ হয়ে গেছে। অথচ এ দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক তাদের উপর অর্পণ করেননি। উন্নতির স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষায় মহিলা দ্বিবিধ দায়িত্ব কবুল করে নিয়েছে।

যেসব দেশে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, সেসব দেশে মহিলারা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গলদঘর্ম রয়েছেন এবং সমাজ অন্ধের মতো এ রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। কিন্তু যারা এ ভয়াবহ সভ্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেছে তারা তার তেতো ফল ভোগ করছে। তারা কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে ফিরে আসার চিন্তা করছে। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের মহান চিন্তানায়ক আর্নল্ড টয়েনবি লিখেছেন ঃ

"মানব ইতিহাসের সেসব যুগই পতনের শিকার হয়েছে যে যুগে মহিলা নিজের কদমকে গৃহের চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে গেছে।"

ডঃ জুড লিখেছেন ঃ "যদি মহিলারা নিজের গৃহে দেখা-শুনা এবং সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব পালনেই সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, এ দুনিয়া বেহেশতের প্রতীক হয়ে যাবে।"

সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু পূর্বেই নিজের উম্মাতকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, সে যুগ তোমাদের জন্য খুবই খারাপ যুগ হবে, যে যুগে তোমরা বেগমদের করায়ত্তে চলে যাবে এবং তোমাদের সামষ্টিক কাজকর্মের বাগডোর তাদের হাতে ন্যস্ত হবে। উপরন্তু তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا كَانَ اُمَرَ ائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ بُخَلاَئُكُمْ وَاُمُرُكُمْ اِلَى نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ مشكوة باب تغير الناس

"যখন তোমাদের শাসক এবং দায়িত্বশীলরা খারাপ লোক হবে, তোমাদের ধনীরা বখিল হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী বেগমদের উপর ন্যস্ত হবে, তখন জমিনের পিঠের চেয়ে জমিনের কোল তোমাদের জন্যে উত্তম হবে।"–মিশকাত

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলা উম্মাতকে বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের সহজাত দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে থাকা তাহলে তোমরা বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। অর্থাৎ তোমাদের সহজাত এবং গৃহের দায়িত্ব আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দায়িত্ব। কোনোভাবেই এ দায়িত্বকে খাটো করে দেখা যাবে না। সে সকল মহিলাইতো সফল যারা নিজেদের এ আসল দায়িত্বকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে। সেসব মহিলা কখনই সফল হতে পারে না যারা বাইরের দায়িত্বের

বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি থাকতে চায়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلٰى بَيْتِ اَوْلَادِهَا فَهِىَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ كنز العمال

"যে মহিলা নিজের সন্তান দেখা-শুনার জন্যে গৃহে বসে থাকে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে।"–কানজুল উম্মাল

মহিলাদের জন্য এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য এবং সফলতা আর কি হতে পারে যে, তারা বেহেশতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকবেন। আর এ সৌভাগ্য প্রত্যেক মহিলাই অর্জন করতে পারে যদি সে সন্তান দেখাশুনা ও গৃহের কাজ আনজাম এবং নিজের আসল দায়িত্ব পালন করে।

প্রকৃতপক্ষে মহিলার শারীরিক গঠন, তার বিশেষ পবিত্র আবেগ-অনুভূতি, তার বিশেষ নৈতিক গুণাবলী এবং তার বিশেষ মেযাজ আল্লাহ পাক সে কাজের উপযোগী করেই তৈরি করেছেন। এ স্বভাবজাত কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার থেকে অন্য কাজ নেয়া যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

## মহিলাদের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কাজ

গৃহের কাজকে খারাপ মনে করা, শিশু প্রতিপালনকে অমর্যাদাকর মনে করা এবং বাইরের সামষ্টিক কাজে অংশ নেয়াকে প্রগতি মনে করা একটি ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম কিছু সীমারেখা টেনে আপনাকে সামষ্টিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার অবশ্যই প্রদান করেছে। কিন্তু এ অধিকার আপনাকে প্রদান করেনি যে, আপনি আপনার সহজাত দায়িত্বকে অমর্যাদাকর মনে করবেন এবং তা ত্যাগ করে বাইরের দায়িত্ব পালনকে প্রগতি মনে করবেন। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নয়ন বলতে এ বুঝায় যে, আপনাকে উন্নত মানব সমাজ গড়তে হবে। আর উন্নত মানব সমাজ গড়তে হলে অত্যাবশ্যক ব্যাপার হলো আপনাকে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন এবং উন্নত চরিত্র ও পবিত্র স্বভাবের মানুষ তৈরি করতে হবে। কেননা, পবিত্র সমাজ ভালো মানুষ দিয়েই তৈরি সম্ভব। এ কাজ মহিলারা ছাড়া কেউই আনজাম দিতে পারে না। ভালো মানুষ ভালো কোলেই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলাম আপনার এ কাজকে সবচেয়ে মর্যাদাকর কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আপনার এ কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ এবং জিহাদকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম দীনের শীর্ষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন ঃ

اَلاَ اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سِنَامِهٖ ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ !

قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذُرْوَةُ سِنَامِهٖ اَلْجِهَادُ ـ ترمذى

"আমি কি তোমাদেরকে দীনের মাথা, স্তম্ভ এবং তার শীর্ষ সম্পর্কে বলে দেবো ? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন, দীনের মাথা হলো আনুগত্য করা, তার স্তম্ভ হলো নামায এবং তার শীর্ষ হলো জিহাদ।"

এ শিক্ষার আলোকে আপনি যদি গৃহ দেখাশুনা এবং সন্তান লালন-পালনের কাজে লেগে থাকেন তাহলে আপনি জিহাদের ময়দানে রয়েছেন এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনার আর মুজাহিদের মর্যাদা সমান।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَاِنَّهٗ جِهَادُكُنَّ ـ مسند احمد ج ٢

"গৃহ দেখাশুনা করা তোমাদের দায়িত্ব। আর এটাই তোমাদের জিহাদের কাজ।"

## সন্তানের খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে না করা

যদি কোনো মহিলার স্বামী মারা যান, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা শুধু বৈধই নয় বরং পসন্দনীয়ও। কিন্তু যদি কোনো মহিলা নিজের সন্তানের খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে না করেন এবং তিনি মৃত স্বামীর ইয়াতীম সন্তানের উপর নিজের রূপ ও যৌবন কুরবানী করে দেন তাহলে তাঁর এ কাজ এতো পসন্দনীয় এবং গ্রহণীয় হবে যে, তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকবেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَوْمَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ اِمْرَاَةٌ اٰمَتْ مِنْ

زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْمَاتُوْا ـ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি এবং (দুশ্চিন্তায়) গণ্ড ঝলসিত মহিলা দু' আঙ্গুলের মতো এক সাথে থাকবো। (ইয়াযিদ বিন যুরাই নিজের মধ্যমা এবং শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলেন) অর্থাৎ সে মহিলা যার স্বামী মারা গেছেন। তিনি একজন উঁচু বংশের সম্ভ্রান্ত এবং রূপবতী মহিলা। কিন্তু তিনি নিজের ইয়াতীম শিশুদের (ভালো লালন-পালনের) খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত থাকেন। এমনকি সে শিশু তার অভিভাবকত্ব থেকে পৃথক হয়ে গেলো অথবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলো।"

স্বামী বঞ্চিত মহিলার অর্থ দু ধরনের হতে পারে। প্রথমত, যাঁর স্বামী মারা গেছেন। দ্বিতীয়ত, যাঁর স্বামী তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আভিধানিক দিক থেকে আইয়েমা সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি বন্ধন থেকে বঞ্চিত। পুরুষ বন্ধন বঞ্চিত হতে পারেন আবার মহিলাও হতে পারেন। এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী বঞ্চিত পুরুষ ও মহিলার সে কাজকে প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ মহিলাটি ইয়াতীম শিশুদের খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে করছেন না। এজন্য এখানে প্রকৃতিগতভাবে বিধবা মহিলার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যদি কোনো মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেন এবং শিশুও কোনো কারণবশত মহিলার দায়িত্বে এসে পড়ে, তাহলে এ মহিলা যদি সন্তানের খাতিরে দ্বিতীয় বিয়ে না করেন, তাহলে তিনিও সে সওয়াবের অধিকারী হবেন বলে আশা করা যায়

# সন্তান লালন-পালন ও মহিলা সাহাবী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারীনী এবং তাঁর হিদায়াতে অবগাহনকারিনী মহিলা সাহাবীবৃন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি নির্দেশ ও শিক্ষা জীবন এবং অন্তর দিয়ে বেশী ভালোবাসতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার উপর আমলের হক আদায় করতেন। এ সকল উঁচু আত্মার মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহাও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেছেন। সন্তানের খাতিরে তাঁরা আরাম-আয়েশ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রূপ-যৌবন সবকিছু কুরবানী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

**প্রতিপালনের দায়িত্ব পালনকারিনী একজন মা**

"আল্লাহ আমার আম্মাজানকে জাযায়ে খায়ের দিন। তিনি আমার লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদেম হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আম্মার ব্যাপারে একথাগুলো বলেছেন।

আনাসের মাতা উম্মে সুলাইম কুনিয়তে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম রামিলা অথবা সাহলা ছিলো এবং লকব ছিলো রামিসা। তাঁর পিতার নাম ছিলো মালহান। আনসারের নাজ্জার গোত্রের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

তাঁর বিয়ে তাঁরই গোত্রের এক নওজোয়ান মালিক বিন নজরের সাথে হয়েছিলো। তার ঔরষেই হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু শিশু থাকাবস্থায় উম্মে সুলাইম মুসলমান হয়ে যান।

উম্মে সুলাইম শিশু সন্তানকে মন-প্রাণ দিয়ে চাইতেন। যখন তিনি শিশুকে কালেমা শিখাতেন তখন মালিক বিন নজর খুব গোস্বা হতো। অবশেষে নারাজ হয়ে সে সিরিয়া চলে গেলো।

সিরিয়ায় তার এক শত্রু সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করলো এবং উম্মে সুলাইম যৌবনকালেই বিধবা হয়ে গেলেন। এক্ষণে বিয়ের পয়গাম আসা

শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি প্রত্যেক পয়গামই এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন ঃ "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পুত্র মজলিসে উঠা-বসা এবং কথাবার্তা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে। অতপর যখন আনাসই আমার বিয়ের ব্যাপারে রাজী হবে তখন বিয়ে করবো।"

উম্মে সুলাইম যুবতী মহিলা ছিলেন। আনাস ছিলো শিশু। উম্মে সুলাইম পেরেশান ছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর নিকট অসহনীয় ছিলো যে, সতালো পিতার দুর্ব্যবহারে শিশু মনে কোনো আঘাত লাগে।

অতপর যখন হযরত আনাস যুবক হলো তখন আবু তালহা পয়গাম প্রেরণ করলো। কিন্তু কিভাবে তা গ্রহণ করতে পারে ! আবু তালহা তো মুসলমান ছিলো না। সে জন্য এ পয়গাম তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু এ প্রত্যাখ্যান ছিলো অত্যন্ত হেকমতের প্রত্যাখ্যান। যাতে আবু তালহার চক্ষু খুলে যায়। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ

يَا اَبَا طَلحَةَ اَلَستُ تَعلَمُ اَنَّ اِلٰهَكَ الَّذِى تَعبُدُ نَبَتَ مِنَ الْاَرْضِ قَالَ بَلٰى قَالَت

اَفَلاَ تَستَحْيِىْ تَعْبُدُ شَجَرَةً ـ اصابه ج دوم ومسند احمد

"আবু তালহা ! আপনি কি জানেন না যে, যাকে আপনি আল্লাহ বানিয়ে পূজা করছেন তা মাটি থেকে মাথা বের করে ? তিনি বললেন, হাঁ, জানি। এরপর উম্মে সুলাইম বলতে লাগলেন, তাহলে বৃক্ষ পূজা করতে আপনার লজ্জা লাগে না ?–ইসাবাহ এবং মুসনাদে আহমদ

একথা শুনে আবু তালহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সে সময় তিনি চলে গেলেন। কিন্তু অন্তরের কালিমা দূর হবার উপক্রম হলো। কিছু দিন পর উম্মে সুলাইমের নিকট এলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে অভিষিক্ত হলেন।

উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন যে, ইসলামের মতো সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পাক আবু তালহাকে অভিষিক্ত করেছেন, তখন তার অসহায়ত্ব ও দারিদ্রের কোনো পরওয়া না করে তিনি বললেন, আবু তালহা ! আমি তোমার পয়গাম কবুল করছি। আমার মোহরানা তোমার ইসলাম। উম্মে সুলাইমের এ বিয়ে সে সুসন্তানের ব্যবস্থাপনাতেই হয়েছিলো যার সুন্দর প্রতিপালনের খাতিরে এতোদিন পর্যন্ত তিনি বিয়েতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আমার মা'র মোহরও ছিলো আশ্চর্য ধরনের।

আল্লাহর দৃষ্টিতে এ নেক স্ত্রীর মর্যাদা কতটুকুন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বর্ণনাতেই তা অনুমান করা যায় ঃ

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَا هذَا فَقِيلَ الرُّمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلحَانَ ـ

صحيح مسلم ج دوم وطبقات ابن سعد ج هشتم

"আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম। এ সময় আমি একটা কিছুর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ শব্দ কিসের ? বলা হলো, এটা মিলহানের কন্যা রুমাইসার আওয়াজ।"

–মুসলিম ও তাবকাতে ইবনে সা'দ

## শিশু প্রতিপালনের জন্য নজিরবিহীন কুরবানী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে মহিলা সাহাবীবৃন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আর কার নিকট বেশী প্রিয় ছিলো। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের চাচা আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানির নিকট বিয়ের পয়গাম পেশ করলেন, তখন তিনি এজন্য ক্ষমা চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে মহিলা সাহাবীদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তাঁরা খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। উম্মে হানি ক্ষমা চেয়ে যে কথা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন তা চিন্তা করে দেখুন। তাহলেই পরিষ্কার হবে যে, মহিলা সাহাবীদের নিকট সন্তান প্রতিপালন কতখানি গুরুত্বের বিষয় ছিলো। উম্মে হানি বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমার এ দু চোখ থেকেও প্রিয়। কিন্তু স্বামীর অধিকার অনেক বেশী। বিয়ে করতে গিয়ে আমি ভয় পাই যে, যদি স্বামীর খিদমতের অধিকার আদায় করি তাহলে এসব অন্তরের মনিদের (সন্তান) অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবো না। আর যদি সন্তানের খিদমতে লেগে থাকি তাহলে স্বামীর হক আদায় করতে পারবো না।"–তাবকাতে ইবনে সা'দ ঃ উম্মে হানি প্রসঙ্গ

এ সেই ভাগ্যবতী উম্মে হানি, যাঁর গৃহে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন গোসল করেছিলেন এবং চাশতের নামায আদায় করেছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে উম্মে হানি যে দু মুশরিককে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।–মুসনাদে আহমদ

# মায়ের দুধ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে স্বভাবজাত কারণেই মা শিশুকে দুধ পান করিয়ে থাকেন। এটা একটি সুপরিচিত নিয়ম বা প্রথা ! এটা মায়ের উপর প্রিয় সন্তানের অধিকার। আবার মাতৃত্বেরও দাবী এটা। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো সমাজের একটি সুপরিচিত নিয়ম ও সাধারণ ব্যাপার। অন্যদিকে প্রত্যেক মা'ই নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়ানোকে প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত দায়িত্ব মনে করেন। নিজের পেটে সন্তানকে স্থান দান, জন্মদান এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্যে নিজের দুধ খাওয়ানো প্রত্যেক মার'ই স্বভাবজাত বৃত্তি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"এবং মায়েরা নিজের সন্তানকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। যাদের পিতা পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে চায়।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে সে সকল মা-কে দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাদেরকে স্বামী তালাক দিয়ে দিয়েছে অথবা খোলা তালাকের জন্য স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মায়ের দুধে শিশুর স্বভাবজাত অধিকার রয়েছে এবং সন্তান শুধু পিতারই নয়, বরং মা'রও অন্তরের টুকরা। সে জন্য মা যেন সন্তানের পিতার উপরকার ক্রোধ সন্তানের উপর না ঝাড়ে এবং সন্তানের হক নষ্ট না করে। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মহিলাদের জন্য পবিত্র কুরআনে যেখানে সন্তানকে দুধ খাওয়ানোকে অস্বীকার না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন এটা পরিষ্কার যে, সন্তানকে দুধ খাওয়ানো হলো একটা অধিকার এবং এটা মায়ের শরয়ী দায়িত্ব। আবার এটাই বা কি করে হয় যে, স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া মহিলার জন্য দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ স্বামীর সাথে অবস্থানকারী মহিলার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। সন্তানের মা হবার কারণে দু অবস্থাতেই এক ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে যাবার কারণে যাতে সন্তান দুধ খাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এ আশংকাতেই পবিত্র কুরআনে এ হেদায়াত দেয়া হয়। স্বামীর সাথে অবস্থানকারী মা-দের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে পৃথকভাবে নির্দেশ না দেয়ার কারণ হলো যে, নিজের সন্তানের দুধ খাওয়ানো তো একটি সাধারণ নিয়ম এবং প্রত্যেক মা'ই নিজের স্বভাবজাত আবেগের অধীন নিজের

সন্তানকে দুধ পান করিয়ে মনের শান্তি এবং আত্মিক আনন্দ অনুভব করে থাকে। এজন্য পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকেও এ নির্দেশ স্পষ্টভাবে জানা যায়। সুতরাং এ মাসয়ালাকে কুরআন আইনগতভাবে স্থায়ীরূপে বর্ণনা করেনি। বরং এটাকে একটা প্রকৃতি প্রদত্ত দায়িত্ব ও সাধারণ নিয়ম হিসেবে বর্ণনা এবং এ রীতি অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মা যেমন সন্তানের বোঝা বহন করে, জন্মদানের কর্ম স্বীকার করে তেমনি সে দু বছর পর্যন্ত নিজের কলিজার খুন পান করিয়ে থাকে।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط ـ

"তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্তসত্ত্বা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ৩০ মাস লেগে গেছে।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

এ আয়াতে মার তিন মহান ইহসানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

**এক ঃ** মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে পেটে স্থান দিয়েছে।
**দুই ঃ** কষ্ট স্বীকার করে তাকে জন্ম দিয়েছে।
**তিন ঃ** মা তাকে নিজের দুধ পান করিয়েছে।

এ তিন নজিরবিহীন ইহসানের দাবী হলো পিতার তুলনায় মাতার তিনগুণ বেশী অধিকার। পবিত্র কুরআনে যাকিছু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভাষ্যকার হিসেবে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণ প্রাপ্তির অধিকার সবচেয়ে বেশী কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা'র পর কে ? বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? ইরশাদ হলো, তোমার মা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? বললেন তোমার পিতা।"–বুখারী ও মুসলিম

কুরআন ও সুন্নাহর এ বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রত্যেক সন্তানের উপর মা'র তিনগুণ বেশী অধিকার রয়েছে। কেননা মা'ও প্রকৃতিগতভাবে নিজের সন্তানের সাথে তিনটি আচরণ করে থাকেন। ন' মাস পর্যন্ত দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে পেটে ধারণ করে। অতপর জীবন বাজি রেখে সন্তান জন্ম দান করে এবং অতপর দু বছর পর্যন্ত নিজের কলিজার রক্ত পান করান। এটা প্রত্যেক মা'র সহজাত প্রবৃত্তি এবং পরিচিত কাজ। এ কাজের

মাধ্যম দিয়ে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত হিকমতের সাথে সন্তানের প্রতি আকর্ষণ এবং ইহসানের কথা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, পিতার চেয়ে মাতা তিনগুণ হকের অধিকারী।

ইসলাম একটি প্রাকৃতিক ধর্ম। এজন্য ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্টে নিক্ষেপ করে না। সাধারণত মা-কে দু বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো উচিত। কিন্তু কোনো কারণে যদি দু বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই দুধ ছাড়িয়ে ফেলা আবশ্যক হয়, তাহলে ইসলাম দু বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো আবশ্যিক করে না। অথবা কোনো মহিলা যদি অসুস্থ হয় অথবা দুর্বল হয় এবং স্বাস্থ্য আরো বেশী খারাপ হবার আশংকা থাকে তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুধ না খাওয়ানোরও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোনো বাস্তব অসুবিধা এবং প্রয়োজন ছাড়া শুধুমাত্র ফ্যাশনের কারণে দুধ না খাওয়ানো সন্তানের অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ এবং পাষাণ হৃদয়ের কাজ হিসেবে বিবেচিত।

যেসব মহিলা আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়ে সন্তানকে দুধ পান করায় না অথবা এ ভয়ে শিশুকে নিজের দুধ থেকে বঞ্চিত রাখে যে, দুধ পান করানোর জন্য তার রূপ, যৌবন ও কমনীয়তা নষ্ট হবে এবং তার যৌবন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে সে মা হয়েও মা'র মমতা আবেগ এবং মা'র অন্তর থেকে বঞ্চিত। কেননা, কোনো দুধই শিশুর জন্য মা'র দুধের বিকল্প হতে পারে না। এ ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ মহিলাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এসব অপসন্দনীয় তৎপরতার অধীন নিজের সন্তানকে দুধ পান করা থেকে বঞ্চিতকারী মহিলাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মিরাজের রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ثُمَّ انطَلَقَ بِىْ فَاِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدَيَهُنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ قِيْلَ هٰؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ اَلْبَانَهُنَّ ـ ترغيب وترهيب

"অতপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। ইত্যবসরে কতিপয় মহিলাকে দেখলাম। যাদের বুকের ছাতি সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন্ মহিলা ? বলা হলো তারা সে

মহিলা যারা নিজের সন্তানকে নিজের দুধ পান করাতো না।"

–তারগীব ও তারহিব

## মা'র দুধের শরয়ী ও নৈতিক গুরুত্ব

মা'র দুধ শিশুর জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য। এ খাদ্য তার জন্য পূর্ণ সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা দান করে। কিন্তু তা শুধু শারীরিক খাদ্যই নয় বরং আত্মিক ও নৈতিক খাদ্যও বটে। মাতৃ দুগ্ধ শিশুর অন্তর, আবেগ-অনুভূতি এবং চরিত্র ও কাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। মা শিশুকে নিজের দুধ পান করিয়ে শুধুমাত্র সন্তানের পুষ্টিকর খাদ্যই যোগায় না বরং দুধের প্রতিটি ফোটার সাথে নিজের পবিত্র চিন্তা-ভাবনা, মহান আবেগ-অনুভূতি, উঁচু আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পসন্দনীয় চরিত্র তার শরীর ও আত্মায় প্রবাহিত করে চলেন। প্রকৃতিগতভাবে শিশু মা'র দুধের সাথে সাথে এসব কিছুই শোষণ করতে থাকে। নৈতিক দিক থেকে মা'র দুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এমনিতেই প্রত্যেক খাদ্যের প্রভাব মানুষের চরিত্র ও কাজের উপর আবশ্যিকভাবে পড়ে। কিন্তু দুধ যেহেতু মানুষের প্রাথমিক খাদ্য এজন্য তার গুরুত্বও বেশী।

কোনো শিশু যদি কোনো কারণে তার আপন মা'র দুধ না পায় এবং তাকে কোনো আজনবী মহিলার দুধ খাওয়াতে হয় তাহলে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, যে মহিলার দুধ খাওয়াবে তার শরীর যেন সুস্থ হয়। পাক-পবিত্রতার দিক থেকেও যেন মহিলাটি সন্তোষজনক হয়। আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তার দিক দিয়েও যেন সে পসন্দনীয় হয়। চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে বিশ্বস্ত এবং আদত ও খাছলাতের দিক থেকে ভালো হয়। যাতে শিশু তার নিকট থেকে সুন্দর চরিত্র লাভ করতে পারে।

মায়ের সাথে শিশুর যে অসাধারণ সম্পর্ক ও গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার প্রধানতম কারণ হলো দুধ। যেসব মা শিশুদেরকে নিজের দুধ পান করায় না তারা সন্তানের জন্য সে আকর্ষণ অনুভব করে না যা শুধু দুধ পান করানোর কারণেই সৃষ্টি হয়। যদি তারা সন্তানদের সম্পর্কে সম্পর্কহীনতা ও শীতল সম্পর্কের অভিযোগ উত্থাপন করে তাহলে সে জন্যে তারাই দায়ী। কারণ সন্তানের জীবনের প্রথম দু বছরে তারা উত্তপ্ত বুকে লাগিয়ে যখন স্নেহ ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্ক সঞ্জীবিত করেনি তখন স্বাভাবিকভাবেই পরিণতি এ হবে।

ইসলামী শরীয়াতে দুধের ব্যাপারে শুধু গুরুত্ব স্বীকারই করা হয়নি বরং তাকে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, তার ভিত্তিতে হালাল হারামের আইন প্রণীত হয়েছে।

আরবীতে দুধ খাওয়ানোকে রাদায়াত বলা হয়। ইসলাম এ রাদায়াতকে প্রায় বংশের সমান সমান শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করে। কোনো কারণে যদি কোনো শিশু কোনো অপরিচিত মহিলার দুধ পান করে তাহলে সে মহিলার সাথে তার রাদায়াতের সম্পর্ক স্থাপন হয়। দুধ পান করনে ওয়ালী মহিলা তার দুধ মা হয়ে যায়। দুধ মা'র মর্যাদা প্রায় আপন মা'র মতোই হয়। এ দুধ পান করানোর কারণে শুধু মহিলাটিই দুধ মা হয় না বরং তার স্বামী শিশুর দুধ পিতা এবং তার সন্তানসমূহ শিশুর দুই ভাই-বোন হয়ে যায়। শরীয়াতে এ আত্মীয়ের মর্যাদা প্রায় বংশীয় আত্মীয়ের মর্যাদার মতোই হয়। বস্তুত সেসব আত্মীয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে সেভাবেই হারাম হয়ে যায় যেমন রেহেমের আত্মীয়ের মধ্যে হারাম থাকে। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ - النساء : ٢٣

"এবং তোমাদের সেসব মা (তোমাদের জন্য হারাম) যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধে অংশীদার বোন সকল।"

অর্থাৎ যে সকল আত্মীয় আপন মাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে হারাম হয়ে যায় দুধ মাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে তারা হারাম হয়। তারই ভাষ্যকার হিসেবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধান বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ - صحيح مسلم

"আল্লাহ পাক দুধ খাওয়ানোর কারণেও সে সকল আত্মীয়কে হারাম করে দিয়েছেন যাদেরকে নসবের কারণে হারাম করেছেন।"—মুসলিম

শরীয়াতে দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে, যদি কখনো অজ্ঞাত কোনো পুরুষ মহিলার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে দুধ খাওয়ানোর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একজন মহিলার স্বাক্ষীতেই সে বিয়ে খতম হয়ে যাবে এবং দুধ খাওয়ানোর সম্পর্ক অবগত হবার পর সে দু ব্যক্তির জন্য এক মুহূর্তের জন্যও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকাটা বৈধ হবে না।

হযরত উকবাহ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মহিলাকে বিয়ে করলেন, বিয়ের পর একজন মহিলা আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের উভয়কেই দুধ পান করিয়েছি। হযরত উকবাহ স্ত্রীর বংশের লোকদের নিকট ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা অজ্ঞতা প্রকাশ

করলেন। অবশেষে হযরত উকবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা খুলে বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা শুনে বললেন, এখন তোমরা কি করে এক সাথে থাকতে পারো। হযরত উকবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে মহিলাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং সে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে করে নিলো।–সহীহ বুখারী

## দুধ খাওয়ানোর সীমাহীন মূল্য

সন্তানকে নিজের দুধ পান করানোর এ অসাধারণ গুরুত্ব এবং বিরাট নৈতিক ও আত্মিক উপকারের প্রেক্ষাপটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা দুধ না খাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণের সাথে সাথে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মুসলমান মহিলাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা অন্তরের টুকরাকে দুধ পান করিয়ে দুনিয়াতেই তার প্রতিদান পাবে না, বরং আখেরাতের জীবনেও তোমাদেরকে অপরিসীম সাওয়াব ও পুরস্কার দেয়া হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَاِنَّ لَهَا مِنْ اَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ اَجْرُ حَيَاةِ نَسَمَةٍ ـ كنز العمال

"এবং মুসলিম মহিলা যে নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায়, একটি মানুষের জীবনদানকারীর বরাবর সওয়াব পাবে।"

–কানযুল উম্মাল

উপরন্তু দুধ দানকারী মহিলাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মুজাহিদের মতো বর্ণনা করেছেন, যে মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় অব্যাহতভাবে পাহারা দানে রত থাকে। যদি সে মহিলা এ সময়ে মারা যায় তাহলে সে শাহাদাতের সওয়াব পেয়ে থাকে।

# চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মাতৃদুগ্ধ

চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও মাতৃদুগ্ধ অসাধারণ উপকারী। চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। আমরা এখানে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা সংস্থার গবেষণামূলক নিবন্ধের কিছু অংশ উপস্থাপিত করবো। এ উদ্ধৃতি থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে, চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে কি চিন্তা করেছেন এবং ইসলাম আপনাকে যে অধিকার আদায়ের উৎসাহ দিয়েছে তাতে আপনার এবং বংশধরদের কি উপকার রয়েছে।

"আধুনিক সভ্যতার অনেক দাবী আমাদেরকে অনেক প্রাকৃতিক আইন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক অন্তসত্ত্বা মহিলা চিন্তা করে থাকে যে, নিজের সন্তানকে নিজের দুধ অথবা গাভীর দুধ পান করাবে ? তাদের অবগতির জন্য এটা লেখা প্রয়োজন যে, গাভীর দুধ মাতৃদুগ্ধের কখনই বিকল্প হতে পারে না। আপনি যদি সব ধরনের এলার্জি, পেটের ব্যথা এবং বদহজম থেকে শিশুকে মুক্ত পেতে চান তাহলে নিজের দুধ পান করান।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিজের দুধ পান করানোর পরই মায়ের শরীর দ্রুত গতিতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে। এছাড়া সময়ের পূর্বেই ভূমিষ্ঠ শিশুর দুর্বলতাও মাতৃদুগ্ধেই দূর হয়।"

**এক মা'র ঘটনা**

নির্ধারিত সময়ের ৬ সপ্তাহ পূর্বেই এক মহিলার শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। হাসপাতালের নার্স তার শরীরের উপর কসে পট্টি বাঁধলো। মহিলাটি নার্সকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এ পট্টি কেন বাঁধলেন।"

নার্স বললো, "আপনার দুধ যাতে না আসে, সেজন্য পট্টি বাঁধা হলো।

"কিন্তু আমি তো শিশুকে আমার দুধ খাওয়াতে চাই।" "আপনি আপনার দুধ খাওয়াতে পারবেন না। নার্স বললো, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আপনার শিশু জন্মগ্রহণ করায় দুর্বল হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আপনাকে তার থেকে পৃথক থাকতে হবে।"

ডাক্তার! মহিলাটি নার্সের প্রতি নিরাশ হয়ে বললো, "আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ? আমি শিশুকে আমার দুধ পান করাতে চাই।"

ডাক্তার ধমকের সুরে বললো, "আপনি জানেন, আপনার সন্তান কিছুদিন আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।"

"এ কারণেই তো আমি তাকে নিজের দুধ পান করাতে চাই। আমি চাই, ঐ দুর্বল দেহে অবিলম্বে শক্তি সঞ্চার হোক এবং সে জীবিত থাকুক।"

"এ প্রশ্নই উঠতে পারে না।

"আপনি যদি তাকে আপনার দুধ পান করাতে চান, তাহলে আমাদেরকে কিছুর মাধ্যমে আপনার দুধ বের করতে হবে। আপনি কি সে জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন ?"

মায়ার কারণে মা সে জন্য প্রস্তুত ছিলো। বস্তু একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে তার দুধ বের করা হলো। কোনো কোনো সময় ১১ আউন্স পর্যন্ত দুধ বের হতো। এ দুধ হাসপাতালের অন্য শিশুও পান করতো। যখন মাকে হাসপাতাল থেকে বিদায় করা হলো, তখন শিশুকে সেখানেই রাখা হলো। কারণ তার ওজন ৬ পাউণ্ড থেকে কম ছিলো। মা গৃহে এক পাম্পের সাহায্যে নিজের দুধ বের করে শিশুর জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে তার বয়স পাঁচ সপ্তাহ হলো এবং তাকে বাড়ী নিয়ে এলো।

আমাদের ফ্যাশন প্রিয় শ্রেণীতে খুব কম মহিলাই এমন পাওয়া যাবে যে, উল্লিখিত মহিলার মতো শিশুকে নিজের দুধ পান করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকেন। এ মহিলা নিজের বান্ধবীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি জানতেন, বোতলে দুধ পানকারী শিশু সবসময় পেটের ব্যথায় আক্রান্ত থাকে, তার সন্তান নির্ধারিত সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও খুব শীঘ্র সাধারণ অবস্থায় এসে গেলো এবং প্রথমে যে দুর্বলতা অনুভব করা হয়েছিলো তা অবিলম্বে দূর হয়ে গেলো।

### মাতৃদুগ্ধ এবং স্বাস্থ্য

যেসব দেশে সভ্যতার আধুনিক দাবীর প্রেক্ষিতে মায়েরা শিশুকে নিজের দুধ পান করানোয় অনীহা প্রকাশ করছেন সেখানে স্বাস্থ্যের মাপকাঠি নিম্নগামী হচ্ছে এবং সন্তানরা মাতা-পিতার চরিত্র থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রথম দিকে কিছুদিন মায়ের দুধে কোলোস্ট্রাম নামক এক ধরনের বস্তু মিশ্রিত থাকে। এ কোলোস্ট্রাম শিশুর মজবুত জীবনী শক্তি দান করে। তাতে যে পরিমাণ ভিটামিন "এ" পাওয়া যায় পরবর্তীতে তা আর পাওয়া

যায় না। তার পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দিকে মা-কে নিজের দুধ অবশ্যই পান করাতে হবে। শিশু মায়ের পেটে এ ভিটামিন লাভ করে না। সুতরাং জীবনের প্রথম দিকে তাকে তা অবশ্যই পেতে হবে। কোলোস্ট্রাম সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদেরকে বাইরের জীবাণু আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে থাকে।

সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের কাশি এবং নিউমোনিয়ার ভয় থাকে। যদি তারা কোলোস্ট্রাম পেতে থাকে তাহলে এ রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা কমে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার এক মাসের মধ্যে যেসব শিশু মারা যায় তাদের অধিকাংশই কোলোস্ট্রাম ঘাটতিজনিত কারণে মারা যায়।

### আধুনিক গবেষণা

গবেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদেরকে সব ধরনের কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখার সর্বোত্তম পন্থা হলো তাদেরকে মায়ের দুধ পান করানো। এ খাদ্য তাদের জন্য ওষুদের প্রয়োজন পূরণ করে। জীবনের প্রথম দিকে শিশুদের যে সকল রোগ হয় তার অধিকাংশ খাবারের কারণেই হয়ে থাকে।

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পশুদের ব্যাপারটি মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গাভীর দুধ তার বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কেননা তাকে খুব তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হয়। মস্তিষ্কের যোগ্যতার তুলনায় শারীরিক শক্তির প্রয়োজন তার একটু বেশী। মানুষের শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই চলা-ফেরা করার প্রয়োজন হয় না। তার মস্তিষ্কের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। মায়ের দুধ এসব যোগ্যতা অর্জনের জন্য মোক্ষম বস্তু হিসেবে কাজ করে।

মায়ের দুধ চর্বির পরিমাণ থাকে ৪ ভাগ। কিন্তু শীল মাছের দুধে চর্বির পরিমাণ থাকে ৪০ ভাগ। ব্যাপারটি স্পষ্ট। কারণ, শীল মাছের শরীরে শীঘ্রই চর্বির একটি পর্দার প্রয়োজন হয়। এ চর্বির সাহায্যে সে বরফ এবং বরফ যুক্ত পানির শীতলতা মুকাবিলা করে বেঁচে থাকে। পক্ষান্তরে খরগোশের দুধে প্রোটিনের অংশ কিছু বেশী থাকে। মানুষের দুধের চেয়ে ১০ গুণ বেশী। এ কারণেই খরগোশের বাচ্চা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পায়। মাত্র ৬ দিনে তার ওজন ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়। মানব শিশুর ওজন দ্বিগুণ হতে ছ' মাস লাগে। এ হলো প্রকৃতির নিয়ম।

## মা'র ছাড়া অন্য দুধ খাওয়ানোর কুফল

আধুনিক ধারণা মতে উচ্চ রক্তচাপ রোগ বেশী বয়সে হয় না। বরং শিশুকালেই তা শুরু হয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো গাভীর দুধের বর্ধিত সোডিয়াম। ফ্যাশন প্রিয় জাতির হৃদরোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য দুধ পান করা। এক জরিপ অনুযায়ী জানা গেছে যে, আমেরিকায় নিজের দুধ পান করনেওয়ালী মায়ের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। বৃটেনের একটি শহরে এ সংখ্যা ৭৭ শতাংশ থেকে কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে এবং পাঁচ বছরে ফ্রান্সে মায়ের দুধ পান করেনি এমন শিশুর সংখ্যা ৩১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তব কথা হলো, প্রকৃতি প্রত্যেক জীবের স্তন্যপায়ী দুধ শুধুমাত্র তার সন্তানের জন্য উপযোগী করে রেখেছে।

## হৃদ্যতা

যে শিশুকে নিজের বুকে নিয়ে দুধ পান করায় সে শিশু দুধ পান ছাড়াও মা'র নিকটে হেফাজতের অনুভূতি লাভ করে। আর এ অনুভূতি সারা জীবনই তার জাগ্রত থাকে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তাকে একজন ভালো মানুষ তৈরি করে। দুধের এ সম্পর্ক মা ও শিশুর মধ্যে অটুট বন্ধন সৃষ্টি করে। এ বন্ধন ও মায়া-মমতার সম্পর্ক বাজারে ক্রয়ের বস্তু হতে পারে না।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, এ রোগের বর্ধিত সংখ্যার অন্যতম কারণ হলো আজকাল মানুষ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত। আধুনিক সভ্যতা মা ও শিশুর মধ্যে এক কৃত্রিম প্রাচীর খাড়া করছে। কাঁচের বা প্লাষ্টিকের জীবনহীন বোতল এবং তাতে ভরা পশুর দুধ মা'র নরম বাহু ও সবদিক থেকে পূর্ণ দুধের বিকল্প হতে পারে না। উপরন্তু দুধ পান করানোর সময় মা যে প্রশান্তি লাভ করেন তার কোনো জবাব হয় না।

# সন্তান প্রতিপালনের খরচ বহন

সন্তান প্রতিপালনের দ্বিতীয় অংশ হলো খরচ বহন। ইসলাম এ খরচ বহন প্রশ্নটি এককভাবে পিতার দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে। কেননা জীবিকার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহ পাক পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন। আর এজন্য আল্লাহ তাকে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তিও দিয়েছেন। শারীরিক সুস্থতা, কঠোর শ্রম, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, চিন্তা-ভাবনা এবং দৈহিক ও নৈতিক শক্তি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদেরকে বেশী দেয়া হয়েছে। কেননা বিশেষ দায়িত্বের জন্যে এসব শক্তি ও যোগ্যতা তার বেশী প্রয়োজন ছিলো। আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে জীবিকার জন্য দৌড়-ঝাপের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে গৃহের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এজন্য মহিলাদেরকে যথাযথ গুণাবলী প্রদান করা হয়েছে। মোটকথা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ধরনের যোগ্যতা প্রদান করে স্ব স্ব ক্ষেত্রের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

### খরচ বহনের অর্থ

খরচ বহনের দায়িত্বের অর্থ হলো ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের সব ধরনের খরচ পিতা বহন করবে। তার ভূমিষ্ঠ হবার খরচ, খানা-পিনা, পরিধান ও ওড়নার খরচ, সেবা তত্ত্বাবধানের খরচ, স্বাস্থ্য ও আরামের খরচ, অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হলে তার বিনিময় প্রদান, সন্তানের মাকে তালাক দেয়া হলে এবং সে যদি শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে তার বিনিময় দান। মোটকথা সন্তান প্রতিপালন ও তার প্রবৃদ্ধির জন্য সব ধরনের ব্যয় বহন করা পিতার শরয়ী দায়িত্ব। পিতা যদি সচ্ছল হয় তাহলে সন্তানের সাদকা, ফিতরা আদায়ও তার উপর ওয়াজিব এবং আকীকা দান মুস্তাহাব।

### ব্যয়ভার এবং পিতার আবেগ

পিতা সন্তানের এ অধিকার অত্যন্ত উদারতার সাথে আদায় করে। গায়ের ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ-সম্পদ নির্দ্বিধায় খরচ করে সে যখন সন্তানকে হাসি-খুশী দেখতে পায় তখন তার সকল ক্লেশ দূর হয়ে যায়। তার পিতৃত্বের স্নেহ আকিঞ্চনের আবেগ শান্ত হয় এবং আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ পাক পিতার অন্তরে পিতৃত্ব সুলভ ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি করে তার এবং সন্তানের উপর বিরাট ইহসান করেছেন। এ স্বভাবজাত মায়া-মমতা ছাড়া শুধুমাত্র কর্তব্য হিসেবে সন্তানের খরচ বহন করা খুব কঠিন কাজ ছিলো এবং খুব কম মানুষই এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতো। ফলে সন্তান প্রতিপালন মানব সমাজে এক কঠিন সমস্যায় রূপ নিতো এবং সাধারণত সন্তান প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত থাকতো। সন্তানের উপর আল্লাহরও বিরাট ইহসান যে, তিনি মাতা-পিতার অন্তরে স্নেহ ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করে তাদের প্রতিপালনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

## ব্যয়ভার ও দ্বীনি দায়িত্ব

মুসলমান পিতা সন্তানের ব্যয় ভার সহজাত ভালোবাসার কারণে বহন করে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে সে এ ধারণাও করে যে, সন্তান প্রতিপালনের জন্য ব্যয় ভার বহন দ্বীনি দায়িত্বও বটে। আল্লাহ সন্তানের অভিভাবকত্ব করার জন্য তার দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন। সন্তানের ব্যয় ভার বহন করে সে একদিকে যেমন পিতৃত্বের আবেগ পূরণ করে, তেমনি আখেরাতে সে এ উত্তম কাজের অফুরন্ত প্রতিদান পাবার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে।

সন্তানের প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসার সাথে সাথে যখন এ শক্তিশালী বিষয় মিলিত হয় তখন সন্তান প্রতিপালনের ব্যয়ভার বহন পরকালীন সফলতার মাধ্যম হয়ে ওঠে। অতএব সন্তান প্রতিপালনে ব্যয়ভার বহনের অর্থ যখন এ সুন্দর লক্ষ্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠে তখন এ দায়িত্ব পালন খুব সহজ হয়ে যায়। মুসলমান পিতা পরকালীন মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ দায়িত্বকে ফরয মনে করে আনজাম দিয়ে থাকে। সন্তান প্রতিপালনের জন্য কঠিনতম শ্রম স্বীকার করে এবং বিরাট কুরবানী দিয়ে আল্লাহ তার উপর যে আমানত ন্যস্ত করেছিলেন তা নষ্ট হয়নি বলে সে আনন্দ অনুভব করে। সন্তান প্রতিপালনে অর্থ ব্যয় করে মনে করে যে আল্লাহর নির্দেশে সে আল্লাহর পথে খরচ করেছে।

হযরত আবু মাসউদ-উল-বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا اَنفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهلِهِ نَفَقَةً يَحتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ ـ متفق عليه، رياض الصالحين ص ١٥٢

"যখন কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালে সওয়াব পাওয়ার জন্যে পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করে তাহলে তার এ ব্যয় (আল্লাহর দৃষ্টিতে) সাদকা হিসেবে পরিগণিত হয়।"

–বুখারী ও মুসলিম

ইহতিসাবের সাথে কোনো কাজ করার অর্থ হলো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন সওয়াবের জন্য কাজ করা এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা না করা।

### উত্তম আদর্শ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে যখন সবচেয়ে ছোট ছেলে হযরত ইবরাহীম ভূমিষ্ঠ হলেন তখন তার গোলাম আবু রাফে তাকে এ সুসংবাদ শুনালো। তিনি আনন্দে তৎক্ষণাৎ একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। সাত দিনের দিন আকীকা করলেন এবং শিশুর চুল কাটালেন। তিনি চুলের সমান রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন।

দুধ খাওয়ানোর জন্য আনসারের অনেক মহিলা প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে খাওলা বিনতে যায়েদ আনসারীকে এ খিদমতের জন্য বাছাই করলেন এবং ইবরাহীমকে তার হাওয়ালা করে দিলেন। এ খেদমতের বিনিময়ে তাঁকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দেয়া হলো।

### আকীকা

সন্তানের আকীকা করা সুন্নাত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামনিজের সন্তানের আকীকা করেছেন এবং আকীকা করার জন্য অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু এটা আবিশ্যিকভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আকীকা নীরেট একটি মুসতাহাব সাদকা। এটা কোনো আবশ্যিক ফরয নয়। যদি কেউ আকীকা না করে তাহলে তাতে তার কোনো গুনাহ নেই। পিতা যদি সচ্ছল হয়, তাহলে আকীকা করা উত্তম। আকীকা সন্তানের জীবনের সাদকা। আকীকা করায় বালা–মুসিবত দূর হয়ে যায় এবং আপদ-বিপদ থেকে সন্তান রক্ষা পায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهٖ وَيُسَمّٰى فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهٗ ـ

جامع ترمذى

"প্রত্যেক শিশুই আকীকার বিনিময়ে রেহেন পেয়েছে। সপ্তম দিনে তার তরফ থেকে পশু যবেহ করতে হবে। সে দিনই তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথার চুল কাটাতে হবে।"–তিরমিজী

আকীকা প্রকৃতপক্ষে সে পশুকে বলা হয় যা নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে সাদকা হিসেবে যবেহ করা হয়। সম্ভব হলে পুত্রের পক্ষ থেকে দুটি বকরা অথবা বকরী এবং কন্যার পক্ষ থেকে একটি যবেহ করতে হবে। কিন্তু পুত্রের আকীকা দু বকরী যবেহ করা আবিশ্যক নয়। এক বকরী অথবা এক বকরাও যবেহ করা যায়। বস্তুত এটা হলো সন্তানের জীবনের সাদকা এবং সন্তানের জীবন তার বিনিময়ে রেহেন থাকে। এজন্য আকীকা করা উত্তম কাজ। কিন্তু শর্ত হলো আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হতে হবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ! اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ ـ جامع ترمذى

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে আকীকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বকরী যবেহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ফাতিমা! তার চুল কাটাও এবং চুল ওজন করে সমপরিমাণ রৌপ্য দান করো। আমরা তার চুল ওজন করলাম এবং তা এক দিরহাম অথবা তার থেকে কিছু কম হয়েছিলো।"–তিরমিযী

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ছেলের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ করাও জায়েয। আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়েছেন এবং সে যদি দুটি পশু যবেহ করতে চায় তাহলে সে আনন্দের সাথে তা করতে পারে। কিন্তু এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ছেলের পক্ষ থেকে দুটি পশু যবেহ করা আবশ্যিক নয়। একটাও করা যায়।

আকীকা জন্মের সপ্তম দিনে করা উচিত। যদি কোনো কারণে সপ্তম দিনে করা না যায় তাহলে চতুর্দশ দিন অথবা একুশতম দিনেও করা যায় এবং তার পরেও করা যায়।

আকীকা একটি সুন্নাত উৎসব। সুন্নাত অনুসরণের নিয়তে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে এ উৎসব পালন করতে হবে। প্রদর্শনী, গর্ব-অহংকার এবং রসম ও রেওয়াজের বেষ্টনীতে যাতে এ সুন্নাতের রীতি অপবিত্র না

হয় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা এ সুন্নাত উৎসবে বিভিন্নমুখী অপচয় করে গান-বাজনার ব্যবস্থা করে তারা নিজেরাও ধোঁকা খায় এবং নিজের রবকেও ধোঁকা দিতে চায়। সুন্নাতের নামে সুন্নাত মিটিয়ে দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের আকীকায় সওয়াব প্রাপ্তির আশাতো দুরূহ ব্যাপার। বরং এ কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কষ্ট লাগে এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

**খাতনা**

খাতনা সকল নবী আলাইহিমাস সালামের সুন্নাত এবং ইসলামী রীতি। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْفِطْرَةُ خَمسٌ، اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَنَتفُ الاِبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ - الادب المفرد ص ١٨٨

"পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে পরিগণিত। খাতনা করা, নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করা, বগলের চুল উঠানো, মোচ কাটা এবং নখ কাটা।"

আল ফিতরাত অর্থ হলো সুন্দর প্রকৃতি বা স্বভাব। অর্থাৎ পাঁচটি বস্তু পবিত্রতার নিদর্শন। এ পাঁচটি জিনিস প্রাচীনকাল থেকে নবীদের সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সকল নবীই এগুলো পালন করেছেন এবং সকলের শরীয়াতেই ঐকমত্য হিসেবে তা পালিত হয়েছে।

শিশু যদি খুব দুর্বল না হয় তাহলে জন্মের সপ্তম দিনেই খাতনা করা উচিত। এতে দু ধরনের কল্যাণ রয়েছে। প্রথমত সে সময় শিশুর চামড়া নরম এবং পাতলা থাকে এবং তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে সপ্তম দিনে খাতনার যে ইঙ্গিত রয়েছে তা পালিত হয়। হযরত সালমান বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِ قُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى - بخارى

"শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে আকীকাহ। অতপর তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে ময়লা ইত্যাদি দূর করো।"—বুখারী

ময়লা ইত্যাদি দূর করার অর্থ হলো চুল কাটানো এবং গোসল করানো ইত্যাদি। কতিপয় আলেমের নিকট খাতনাও এ নির্দেশের মধ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেননা খাতনাও ময়লা দূর করা এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য।

এজন্য সপ্তম দিনে খাতনা করিয়ে নেয়া দরকার। যদি কোনো কারণে তা না হয় তাহলেও ৪০ দিনের মধ্যে করিয়ে নিতে হবে। অথবা যে কোনো সময় করাতে হবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য দুটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে।

প্রথমতঃ খুব বেশী দেরী যেন না হয়ে যায়। সাত বছরের মধ্যে খাতনা করিয়ে নেয়া ভালো। কেননা এরপর চামড়া মোটা হয়ে যায়। ফলে বেশী কষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ এ সুন্নাতকে বিরাট জাঁকজমক ছাড়া অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে পালন করতে হবে। অবস্থা অনুকূল হলে এ সুন্নাত আদায়ের খুশীতে নিজের বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে খাওয়ানো যায়। কিন্তু একে একটা স্থায়ী উৎসবে পরিণত করা এবং প্রদর্শনীর জন্য খরচ করাকে প্রয়োজন মনে করা ইসলামের প্রকৃতির সাথে মিল খায় না। অকারণে নিজের উপর কোনো কিছুকে আবশ্যক করে নেয়া, অতপর জেরবার হওয়া এবং নিজের জন্য পেরেশানী সৃষ্টি করা শরীয়াতের নাফরমানীর সমতুল্য।

হযরত ওসমান বিন আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো এক ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে খাতনার উৎসবে যোগদানের জন্য দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে যোগ দেননি। যখন তাকে সেখানে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো তখন বললেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা কোনো খাতনার উৎসবে যোগ দিতাম না এবং ডাকাও হতো না।"

এ সুন্নাত অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে পালন করাই উত্তম। যাতে এটা খামাখাই মানুষের উপর বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। অবশ্য শিশুর পিতা যদি সচ্ছল হয় এবং আল্লাহ তাকে এ সুন্নাত পালনের তাওফিক দিয়েছেন এ ধারণায় কিছু লোককে খানা-পিনা করাতে চায় অথবা কিছু মিষ্টি বিতরণ করতে চায় তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এটা যাতে কোনো প্রথা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে সবিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

**দুধ মাতার দুধের বিনিময়**

দুধ পান করানেওয়ালী মহিলার বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব পিতার। যদি পিতা শিশুর মা-কে তালাক দিয়ে থাকে অথবা সে খোলা করিয়ে নেয়

তাহলে শিশুকে তার মা'র দুধ পান করানোই উত্তম এবং শিশুকে নিজের দুধ থেকে বঞ্চিত না করাই মা'র উচিত। এ অবস্থায় সন্তানের পিতার উপর মাতার ব্যয়ভার বহন ফরয এবং তার খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি মা না থাকে অথবা কোনো কারণে অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করাতে হয় তাহলেও তার বিনিময় প্রদান পিতার শরয়ী দায়িত্ব। যদি পিতার মৃত্যু হয় তাহলে শিশুর দাদা অথবা শিশুর যে কোনো অভিভাবককে দুধ পান করানোর বিনিময় প্রদান দায়িত্ব হবে। পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَفِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ O البقرة : ٢٣٣

"এবং মায়েরা নিজের শিশুদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। যাদের পিতা পূর্ণ মেয়াদের দুধ পান করাতে চায়, এ অবস্থায় শিশুর পিতাকে সুন্দরভাবে তার খাবার ও কাপড় দিতে হবে। কিন্তু কারোর উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা আরোপ করা যাবে না। সন্তান মায়ের একথা বলে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। আবার সন্তান পিতার একথা বলে পিতাকেও কষ্ট দেয়া যাবে না। দুধ পান করানেওয়ালীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর রয়েছে তেমনি তার উত্তরাধিকারদের প্রতিও রয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে তাতে কোনো বাধা নেই। তুমি যদি অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করাতে চাও তাহলে তাতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হলো দুধের বিনিময় যা নির্ধারিত করবে তা সুন্দরভাবে দেবে। আল্লাহভীতি অবলম্বন করো এবং ইয়াকীন রেখো যা কিছু তুমি করছো আল্লাহ তা অবলোকন করছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

এ আয়াত থেকে দুধ পান করানো সম্পর্কিত ৭টি মৌলিক নির্দেশ পাওয়া যায় ঃ

**এক ঃ** মায়েরা নিজের সন্তানদেরকে সাধারণত দু বছর দুধ পান করাবেন।

**দুই ঃ** যে সকল মা কোনো কারণ বশত পিতা থেকে পৃথক হয়ে গেছেন তারাও নিজের শিশুকে পূর্ণ মেয়াদ দুধ পান করাবেন। হাঁ যদি শিশুর পিতা পূর্ণ মেয়াদ দুধ পান করাতে চান তাহলে এটা করতে হবে।

**তিন ঃ** দুধ পান করার মেয়াদে শিশুর মা'র খাদ্য ও কাপড়-চোপড়ের খরচ শিশুর পিতাকেই বহন করতে হবে।

**চার ঃ** শিশুর পিতা যদি না থাকে তাহলে দাদা অথবা যে ব্যক্তিই শিশুর ওয়ালি হবেন তারই দায়িত্ব হবে দুধ খাওয়ানোর বিনিময় প্রদান।

**পাঁচ ঃ** কারোর উপর তার সাধ্যের বেশী বোঝা আরোপ করা যাবে না। একদিকে মা-কে যেমন উত্যক্ত করা যাবে না যে, সে সন্তানের মমতায় বাধ্য হয়ে দুধ খাওয়াবেই। অতএব, তাকে কম বিনিময় দেয়াই যাবে। আবার পিতার নিকট বেশী বিনিময় দাবী করে তাকে পেরেশানও করা যাবে না।

**ছয় ঃ** যদি শিশুর মাতা-পিতা পারস্পরিক সম্মতি এবং পরামর্শের ভিত্তিতে দু বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

**সাত ঃ** মা যদি কোনো কারণে শিশুকে নিজের দুধ পান করাতে না চায় তাহলে অন্য মহিলার দুধ খাওয়ানো জায়েয। অবশ্যই তার বিনিময় নির্ধারণ করে সুন্দরভাবে তা আদায় করতে হবে।

এ সাতটি মৌলিক নির্দেশ শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয়, বরং তা আমলের জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং এর উপর তারাই সঠিকভাবে আমল করতে পারে যারা দুটি মৌলিক গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ আল্লহভীতি এবং আল্লাহ সবকিছু দেখেন এ জ্ঞান ও আস্থা যাদের রয়েছে তারাই সাতটি মৌলিক নির্দেশ পালনে সামর্থ্য।

তাকওয়া বা আল্লাহভীতির অর্থ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আবেগ। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে এমন কোনো কাজ না করা যাতে তার ক্রোধের কারণ হয় এবং আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত

হয়ে আন্তরিকতার সাথে প্রতিটি কাজ করা যা আল্লাহর সন্তুষ্টির অবলম্বন হয়।

আল্লাহ্ সবকিছু অবলোকনকারী হবার ইয়াকিন বা আস্থা হলো একটি বিরাট ঈমানী শক্তির নাম। এ শক্তি একদিকে মানুষকে গাফলতি, বেপরোয়া এবং ভুল পথে চলা থেকে হিফাজত করে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহর নিকট থেকে সওয়াব ও পুরস্কার পাবার জন্য স্থায়ীভাবে তৎপর রাখে।

# কুরআনে সন্তানের ব্যয় ভার বহনের নির্দেশ

পবিত্র কুরআনে অবশ্য সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় ভার বহনের নির্দেশ পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ নেই। কুরআনে একথা বলা হয়নি যে, "সন্তানের জন্য ব্যয় ভার বহন করো।" অথবা "সন্তানের ব্যয় ভার বহন ফরয।" আবার এর অর্থ এও নয় যে, সন্তানের জন্য ব্যয় ভার বহন করার নির্দেশ কুরআনে নেই এবং তার তাকিদ শুধু হাদীসেই এসেছে।

কুরআন প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত উঁচুস্তরের কালাম বা বাণী। হুকুম আহকাম এবং কানুন বর্ণনার ক্ষেত্রে এতে অত্যন্ত হাকিম সুলভ বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে। এ বর্ণনায় মানুষের প্রকৃতি, আবেগ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

সন্তান লালন-পালনে ব্যয় ভার বহন মানব সমাজে এমন একটি সুন্দর প্রাকৃতিক, স্বভাবজাত এবং প্রিয় কাজ যা কুরআন পাকে হুকুমের শিরোনামের বর্ণনার প্রয়োজনই অনুভব করেনি এবং সাথে সাথে অত্যন্ত হিকমতের সাথে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পিতা সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় ভার বহনের জিম্মাদার।

উপরে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে, পিতা নিজের শিশুকে যে মহিলাকে দিয়েই দুধ পান করাতে চান না কেন সে মহিলাকে খাবার, কাপড় অথবা দুধের বিনিময় দানে বাধ্য থাকবে। যদি পিতা না থাকে তাহলে শিশুর যিনি অভিভাবক হবেন তার উপরই এ দায়িত্ব অর্পিত হবে। একজন অপরিচিত মহিলার ব্যয় ভার বহনের দায়িত্ব কুরআনে আপনার উপর এজন্যই অর্পণ করেছে যে, সে আপনার সন্তানকে দুধ পান করিয়েছে। একজন অপরিচিতি মহিলা যদি আপনার শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে সুন্দরভাবে তার খরচ বহন করা আপনার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর এটা এজন্য যে, সে আপনার সন্তানকে দুধ পান করিয়েছে। আপনার সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য একজন অপরিচিত মহিলার ব্যয় ভার বহনের দায়িত্ব যদি আপনার কাঁধে অর্পিত হয় তাহলে সন্তানের ব্যয় ভার বহনের দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে না এটা কি করে সম্ভব ? দুধ পান করানেওয়ালী মহিলাকে আপনি যা কিছু দেন তা আপনার শিশুর খাদ্য এবং সেবার বিনিময়ে তো দিয়ে থাকেন। এ বিনিময় দানের দায়িত্ব

পিতার উপরই অর্পণ করে কুরআন এ তাৎপর্যই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, সন্তান প্রতি পালনের ব্যয় ভার বহনের একক জিম্মাদার হলো পিতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষায় সে তাৎপর্যেরই বর্ণনা দিয়েছেন।

# হাদীসের আলোকে সন্তানের ব্যয়ভার বহন

হাদীস শরীফে সন্তান প্রতিপালনে ব্যয়ভার বহন প্রশ্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল দিক দৃষ্টিতে রেখেই একজন মুসলমান দীনের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান প্রতিপালন করে নিজের সাফল্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

**প্রাথমিক খরচ সন্তানের জন্যই**

আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে সম্পদ দান করেছেন তাতে সর্বপ্রথম অধিকার হলো আপনার সন্তানের। সন্তানের উপর খরচ করা নিছক দুনিয়াদারী বা বস্তুগত ব্যাপার নয় বরং এটা দীনের সরাসরি দাবীও। দীনের নির্দেশ হলো, সর্বপ্রথম সন্তানদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করতে হবে। তাদের প্রয়োজন পূরণ দুনিয়াদারী নয় বরং দীনদারী।

তাদের হক মেরে বা অধিকার হরণ করে অথবা তাদেরকে কারোর করুণার উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি দান-খয়রাত করবেন, এটা পসন্দনীয় কাজ নয়। মূলত সে দান-খয়রাতই পসন্দনীয় যার পরও সচ্ছলতা থাকে এবং সন্তানরা কোনো ধরনের কষ্টে নিপতিত না হয়। এমন সাদকা বা দান-খয়রাত যা করার পর সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের নিকট হাত পাততে হয় তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পসন্দ করতেন না। আর দীনের আলোকে এটাও নেক কাজ নয় যে, আপনার সন্তানরা বিভিন্নজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর আপনি অন্যান্য ভালো পথে খরচ করেন। এভাবে এটাও দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক যে, মানুষের নিজের সন্তান ভুখা-নাঙ্গা থাকবে, তাকে মেপে মুখে দেয়া হবে আর নাম প্রচার ও খ্যাতি অথবা ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্য উদারতার সাথে খরচ করা হবে। আপনার ধন-সম্পদের প্রথম হকদার হলো আপনার প্রিয় সন্তান। এ সন্তান যদি আপনার তালাক দেয়া স্ত্রীর সন্তানও হয়। মোটকথা তারা আপনার সন্তান। তাদেরকে অসহায় বা দারিদ্রে রেখে নিজে আরাম-আয়েশ করা অথবা অন্যদেরকে আরামে রাখা হক মারার শামিল। অন্যদেরকে দেয়ার ব্যাপারে আপনার উদারতা প্রদর্শনের এ কাজ সংশোধনযোগ্য। আপনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াত হলো আপনি সর্বপ্রথম সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করবেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِىً وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ- بخارى، مشكوة باب فضل الصدقة عن ابى هريرة وحكيم بن حزام ص ١٧٠

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সাদকা তা যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের উপর খরচ করো যাদের ব্যয় ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে।"–বুখারী

এ হাদীসে মুসলমান মাতা-পিতা এক ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজাত নিয়ম লাভ করেছে। প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত আকাঙ্ক্ষা হলো তার ধন-সম্পদ তার সন্তানদের কাজে আসুক এবং তারা আরাম-আয়েশের জীবন অতিবাহিত করুন। ধন-সম্পদ অর্জনের সবচেয়ে বড়ো কারণ এটি এবং সর্বপ্রথম পসন্দনীয় ব্যয়ের খাতও এটিই। ইসলাম দান খয়রাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বরং একে ঈমানের দাবী বলে আখ্যায়িত এবং বখিলী ও অনুদারতাকে মুনাফিকীর আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, সর্বপ্রথম সে সকল লোকের প্রয়োজনাবলী পূরণ করো যাদেরকে তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। সন্তানদের প্রয়োজনাবলী উপেক্ষা করে দান-খয়রাত করা ইসলামে পসন্দনীয় নয়। উত্তম সাদকা তাই যার পর সন্তানরা কষ্টে নিপতিত না হয়।

### সন্তানেরব্যয় ভারবহনে অবহেলা কঠিন গুনাহ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضِيْعَ مَنْ يَّقُوْتُ- رياض الصالحين، ابوداود، عن عبد الله بن عمر وبن العاص رض

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের গুনাহগার হবার জন্য একথাই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যাদেরকে সে খানা-পিনা করাচ্ছে।"

মানুষকে যেসব মানুষের জিম্মাদার বানানো হয়েছে তাদের ব্যয় ভার বহনে গাফলতি করা এবং তাদেরকে ক্ষতি করা এমন সঙ্গীন গুনাহ্ যা এককভাবে তাকে আল্লাহর নাফরমান ও গুনাহগার আখ্যায়িত করার জন্য যথেষ্ট। এ গাফলতির কয়েকটি রূপ হতে পারে ঃ

o খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জন্য সে খুব ব্যয় করে থাকে। কিন্তু সন্তান-সন্ততির অধিকার সম্পর্কে গাফেল।

o নিজে খুব আরাম-আয়েশে কাটায়। পক্ষান্তরে সন্তানেরা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর।

o দীনের সঠিক ধারণা না থাকার কারণে নিজের ধন-সম্পদ অন্যান্য ভালো কাজে ব্যয় এবং সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনাবলী পূরণে গাফলতি করছে।

o সন্তান জীবন–মৃত্যুর টানাপোড়নে কাটাচ্ছে। আর সে সময় সে অনুভূতিহীন অবস্থায় হাত-পা নড়ানো এবং কোনো কিছু করতে প্রস্তুতই নয়।

সন্তানের ব্যয়ভার বহন প্রত্যেক পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্বানুভূতি না থাকা এবং তার দাবী পূরণে গাফলতি প্রদর্শন সঙ্গীন গুনাহ।

## যে ব্যয়ের সওয়াব সবচেয়ে বেশী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا اَلَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ

– صحيح مسلم

“হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক আশরাফী যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গোলামের গোলামী থেকে মুক্তির জন্যে খরচ করেছ, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গরীবকে সাদকা হিসেবে দিয়েছ এবং এক আশরাফী যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সওয়াব সেই আশরাফীর যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।”

এ রাওয়ায়েতের আরো ব্যাখ্যা হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে করা যায়। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"সবচেয়ে উত্তম আশরাফী সেই আশরাফী যা মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করে থাকে এবং সেই আশরাফী যা মানুষ আল্লাহর পথের সওয়ারীর জন্য খরচ করে এবং সেই আশরাফী যা মানুষ আল্লাহর পথের সঙ্গীদের জন্য খরচ করে। আবু কালাবা (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করা থেকে কথা শুরু করেন এবং বলেন, সে ব্যক্তি থেকে বেশী সওয়াব ও পুরস্কার কে পেতে পারে যে নিজের ছোট ছোট সন্তানের জন্য খরচ করে। যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে হাত পাতা থেকে বাঁচায় এবং সচ্ছল অবস্থায় বানিয়ে রাখেন।"-জামে তিরমিযী

## যে পিতার চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় চমকাবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهٗ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ - بهقى فى شعب الايمان

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাধ্যমে দুনিয়া তলব করলো, যাতে নিজেকে অন্যের নিকট হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এজন্য দুনিয়ায় অর্জন করেছে যে, অন্যদের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন।"

**সন্তানের জন্য খরচকারিণী মা'র সওয়াব**

ইসলাম পিতাকে সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় ভার বহনের একক জিম্মাদার আখ্যায়িত করে মা-কে জীবিকা অর্জনের দৌড়-ঝাপ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যাতে সে সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের অংশের দায়িত্ব আনজাম দিতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, কোনো মা যদি নিজের সন্তানের জন্য ব্যয় করে তাহলে সাওয়াব ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অথবা স্বামী অক্ষম ও মাজুর হয়ে পড়েছে এবং মাতা নিজের সন্তানের জন্য ব্যয় নির্বাহ করে তাহলে সে তার উত্তম আচরণের পুরস্কার ও সওয়াব অবশ্যই লাভ করবে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِيْ فِيْ بَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - متفق عليه رياض الصالحين ص ١٥٢

"হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রদের উপর ব্যয় করার জন্য সওয়াব পাবো ? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা এভাবে অভাবগ্রস্তের মতো পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তারা তো আমরাও পুত্র। তিনি বললেন, হাঁ, তুমি তাদের উপর যে ব্যয় করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে।"–বুখারী ও মুসলিম

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম স্বামী হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে দু পুত্র ও দু কন্যা ছিলো। তাদের ব্যাপারেই তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ হাদীস থেকে দুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মা নিজের সন্তানের জন্য খরচ করতে বাধ্য না হলেও যাকিছু খরচ করবেন তার সওয়াব ও পুরস্কার অবশ্যই পাবেন।

একজন মু'মিন মায়ের চিন্তাধারা কেমন হওয়া প্রয়োজন সে ইঙ্গিতও এ হাদীস থেকে লাভ করা যায়। হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানের প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা ছিলো। সে জন্য তিনি তাদের অভিভাবকত্ব করার ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি

তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা অভাবগ্রস্তের মতো এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।"

কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ প্রশ্নও চিন্তা করেছেন যে, এ উত্তম কাজের জন্য আখেরাতেও সাওয়াব পাওয়া প্রয়োজন। কেননা মু'মিনের প্রত্যেক কাজের বুনিয়াদই হলো আখেরাত। সে আখেরাতের সাফল্য থেকে বেপরওয়া হয়ে কোনো কিছু করতে পারে না।

# কন্যা প্রতিপালন

সন্তান প্রতি পালনের এ সাধারণ হেদায়াতের সাথে সাথে ইসলাম কন্যা প্রতিপালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং কন্যা প্রতিপালনের বিরাট সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে বলে বিশেষভাবে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কন্যা একটি দুর্বল সৃষ্টি। বছরের পর বছর ধরে তার প্রতিপালন ও ব্যয় নির্বাহের পরও তার থেকে পিতা-মাতা কোনো বিনিময় পাবে এমন আশা করা যায় না। তার থেকে কোনো খিদমত প্রাপ্তিরও আশা করা যায় না। কেননা যেই কন্যা খিদমতের উপযুক্ত হয় তখনই তাকে অন্যের খিদমতের জন্য সোপর্দ করে দিতে হয়। এ সকল অবস্থায় ইসলামের শিক্ষা যদি মানুষের সামনে না থাকে তাহলে কন্যা প্রতিপালনের হক আদায় তার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং সে যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ও সম্মানের অধিকারী তাও সে দিতে পারবে না। এজন্য এসব হেদায়াত বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে কন্যা প্রতিপালনের ব্যাপারে ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে তা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে।

**কন্যা প্রতিপালনের সৌভাগ্য**

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ

– رياض الصالحين، صحيح مسلم

"যে ব্যক্তি দু কন্যা প্রতিপালন করলো। এমনকি তারা দুজন উভয়ে বালেগ এবং জওয়ান হয়ে গেল। কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে সে এবং আমি এ দু আঙ্গুলের মতো এক সাথে হবো এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে দেখালেন।"–রিয়াদুস সালেহীন, সহীহ্ মুসলিম

একজন মু'মিন মা এবং মু'মিন পিতার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বন্ধু হিসেবে মিলিত হবেন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "তাবলুগা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। তার অন্যতম অর্থ হলো, ঐ দু' কণ্যা যুবতী হয়ে গেল। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা মনযিল অথবা মকসুদে পৌছে গেল। যার অর্থ হলো, তারা নিজের গৃহে নিজের স্বামীর অভিভাবকত্বে পৌছে গেল।

### যে মা'র জন্য জান্নাত ওয়াজেব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِيْ مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ اِلٰى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَاَعْجَبَنِيْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ـ

رياض الصالحين، صحيح مسلم

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একজন গরীব মহিলা তার দুটি কন্যাসহ আমার নিকট এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুটি খেজুর তার দু মেয়েকে দিলো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি দু ভাগে ভাগ করে দু কন্যাকে দিয়ে দিলো। এ কাজ আমার খুব ভালো লাগলো। আমি তার এ কাজের কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ এ দু কন্যা প্রতিপালনের বদৌলতে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন।"

### কন্যা মাতা-পিতার জান্নাত

আল্লাহ যদি আপনাকে কন্যার মা অথবা পিতা বানিয়ে থাকেন তাহলে আপনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আল্লাহ পাক আপনার জান্নাত আপনার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিয়েছেন। এখন এটা আপনার কাজ যে, আপনি সে জান্নাতকে হিফাজত অথবা ধ্বংস করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আপনি যদি

কন্যা প্রতিপালনের হক আদায় করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ وَيَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ اَلْبَتَّةَ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ وَثِنْتَيْنِ ـ

الادب المفرد ص ١٥

"যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে। সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিবাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করেছে এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কোনো গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি দু কন্যা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, যদি দু কন্যা হয় তাহলেও এ সওয়াব পাওয়া যাবে।"–আল আদাবুল মুফরাদ

মিশকাত শরীফে এ মর্মার্থের আরো হাদীস রয়েছে। সে হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেছেন, যদি মানুষ এক কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একের ব্যাপারেও এ সুসংবাদ দিতেন।

## অসহায় কন্যার ব্যয়ভার বহন

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ

مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ ـ

ابن ماجه، جمع الفوائد باب بر الاولاد

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে উত্তম সাদকার কথা কেন বলে দেব না। তাহলো তোমাদের সে কন্যা যাকে তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমরা ছাড়া তাকে কামাই করে খাওয়ানেওয়ালা নেই।"

এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে সে মেয়ে, বিয়ে হওয়ার পর যাকে পুনরায় তার মাতা-পিতার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটা তার স্বামীর মৃত্যুর কারণেও হতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ীতে তার ব্যয় ভার বহনের কেউ না থাকায় অথবা স্বামী কোনো কারণে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন এবং মাতা-পিতার নিকট চলে এসেছেন। আবার এ হাদীসের অর্থ সে মেয়েও হতে পারে যার বিয়ে হয়নি অথবা বিয়ের যোগ্য নয়।

# ঈমান দীপ্ত বিপ্লব

ইসলামের এ সকল বৈপ্লবিক শিক্ষার বদৌলতে কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আরবের জমিনে যে ঈমান বৃদ্ধিকারক বিপ্লব এসেছিলো তা ইতিহাসের একটি স্বর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এ অত্যাশ্চর্যজনক বিপ্লবের বরকতের সঠিক চিত্র সে সকল সৌভাগ্যবানই প্রত্যক্ষ করেছেন যারা সে যুগে জীবিত ছিলেন। যাদের চক্ষু ও চিন্তার জগতের বিপ্লবের পূর্বেকার দুঃখজনক চিত্রও অবলোকন করেছে এবং বিপ্লব পরবর্তী ঈমান বৃদ্ধিকারক দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করেছে—তারাই জানে যে, বিপ্লব কাকে বলে। কিন্তু আজও যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠার সে সোনালী অধ্যায়ের কোনো ঝলক সামনে আসে তাহলে চক্ষু আলোকিত হয় এবং ঈমান উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পূর্বে আরব জগতে কন্যার ব্যাপারে পিতার কঠোর অন্তর এবং যালেম হওয়াটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো মর্যাদাকর ব্যাপার। সে নিজের মাছুম এবং দুর্বল কন্যার জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দিতো। সে যুগের একজন কবি বলেন ঃ

تَهْوِىْ حَيَاتِىْ وَاَهْوِىْ مَوْتَهَا شَفَقًا ـ وَالْمَوْتُ اَكْرَمُ نِزَالٍ عَلَى الْحَرَمِ ـ

"সে আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে এবং আমি তার উপর স্নেহের খাতিরে তার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করি। এজন্য যে, মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান মেহমান হলো তার মৃত্যু।"

অন্য আর এক কবি বলেন ঃ

اِنَّ النِّسَآءَ شَيَاطِيْنٌ خُلِقْنَ لَنَا ـ فَوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ ـ

"প্রকৃতপক্ষে মহিলারা হলো শয়তান। তাদেরকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এসব শয়তানের খারাপ থেকে পরিত্রাণ দিক।"

বাহরার রঈসের কন্যার ইন্তেকালে আবু বকর খাওয়ারিযমী শোক বাণী লিখতে বলেন ঃ

"আপনি যদি মৃত ব্যক্তির পর্দার কথা উল্লেখ করতেন অথবা তার সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করতেন তাহলেও আপনার জন্য শোক বাণীর

পরিবর্তে মুবারকবাদই বেশী ভালো হতো। কেননা প্রকাশ অযোগ্য বস্তুর লুকিয়ে যাওয়াই উত্তম এবং শিশু কন্যাদেরকে দাফন করাই বড়ো মর্যাদাকর কাজ। আমরা এমন এক যুগ অতিক্রম করছি যে, এ যুগে যদি কোনো লোকের স্ত্রী তার জীবদ্দশায় মারা যায় তাহলে সে যেন সকল নিয়ামতের অধিকারী হয়। আর সে যদি স্বহস্তে নিজের কন্যাকে গর্তে পুঁতে দেয় তাহলে সে নিজের জামাইয়ের পুরো প্রতিশোধ নিয়ে নিলো।"

বনু তামিমের সরদার কায়েস বিন আছেম স্বয়ং রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি স্বহস্তে নিজের নিষ্পাপ ১০টি কন্যাকে জীবিত দাফন করেছিলেন। অন্য আরেক ব্যক্তি তার দুঃখপূর্ণ ঘটনার চিত্র এমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেরেশান হয়ে গেলেন এবং এতো কাঁদলেন যে, দাড়ি মুবারক অশ্রুতে ভিজে গেল।

সে আরব সমাজ ইসলাম গ্রহণ করে যখন ইসলামী শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করলো তখন কয়েক বছরের মধ্যে তার চেহারাই পাল্টে গেল। মেয়েদের অস্তিত্বই যাদের নিকট ছিল লজ্জার বস্তু সে মেয়েই তাদের জন্য হয়ে গেল নাজাতের আধার। যারা কন্যাকে মায়েদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জীবিত দাফন করে দিতো, তারাই গরীবদের কন্যা প্রতিপালনের জন্য পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত হলো।

**এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য**

উমরাহ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন এক ইয়াতীম কন্যা চাচা চাচা বলে দৌঁড়ে এলো—মেয়েটি ছিল হযরত হামজার কন্যা। সে মক্কাতেই ছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে মেয়েটিকে কোলে উঠিয়ে নিলেন এবং হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোলে দিতে দিতে বললেন, এটা তোমার চাচার মেয়ে। অতপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে মেয়েকে নেয়ার জন্য পরস্পর ঝগড়া করতে লাগলেন।

হযরত জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ শিশু কন্যা আমার পাওয়া উচিত। কেননা, সে আমার চাচার মেয়ে। আর আমিই তার বেশী হকদার। কারণ, তার খালা আমার ঘরে রয়েছে। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ শিশু

কন্যাকে আমার হাওয়ালা করে দিন। মেয়েটির পিতা আমার দীনি ভাই ছিলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম থেকেই তাকে কোলে নিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হুজুর ! এতো আমার বোন এবং প্রথমে আমার কোলেই এসেছে। এজন্য আমারই প্রাপ্য।

মেয়ে প্রতিপালনের এ অস্থিরতা সত্যি আশ্চর্য এবং মনোলোভা দৃশ্য ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনজনের কথাই গভীরভাবে বিবেচনা করলেন এবং শিশু কন্যাটিকে খালার হাওয়ালা করে বললেন, অর্থাৎ খালা মায়ের সমান হয়ে থাকে।–বুখারী

# সুন্দর আচরণ

সন্তানের তৃতীয় হক বা অধিকার হলো তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা করা, তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করা এবং এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আবেগ আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাদের মন ভেঙ্গে না যায়, তারা নিরাশ না হয়ে পড়ে অথবা তাদের অহমবোধ ও আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে।

আপনার অধীনের আপনার প্রিয় শিশু সন্তান আপনার দিকে স্নেহ প্রাপ্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটা আপনার জন্য আল্লাহর পুরস্কার। এ পুরস্কারের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং তার পুরস্কারের অমর্যাদা করবেন না। সন্তানদের মর্যাদা দিন এবং তাদের সাথে সে আচরণ করুন যার তারা যোগ্য।

সন্তান আল্লাহর আমানত। এ আমানত রক্ষা বা হিফাজত করুন এবং নিজের নাদানী ও খারাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এ আমানতকেই নষ্ট করবেন না। সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করুন যাতে তারা যোগ্য হয়ে দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় এবং আপনার মান-মর্যাদা, সুনাম ও পরকালের মুক্তির পাথেয় হয়।

### অসদাচরণের ভয়ংকর পরিণাম

সন্তানের সাথে আপনার আচরণ যদি ভালো না হয়, তাহলে এটা নিজের সাথে, সন্তানের সাথে এবং সমাজের সাথে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কথায় কথায় রাগ করা, চেঁচানো, ভয় দেখানো, গালমন্দ করা, অকাল কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা, তাদের নির্বুদ্ধিতায় অস্থির হয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, গালি দেয়া, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা, তাদেরকে অহেতুক খেলাধুলা ও হাসা-হাসির সুযোগ না দেয়াই হলো সন্তানের সাথে অসদাচরণ। এ অসদাচরণের পরিণতি খুবই খারাপ এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। এ ভয়াবহ পরিণতি সন্তান, মাতা-পিতা ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।

প্রথম বয়সে সন্তান যখন বুদ্ধিহীন, দুর্বল এবং অসহায় থাকে তখন সে আপনার মুহাব্বাত ও মেহেরবানীর অধিকারী থাকে। তখন সে আপনার স্নেহ, হামদরদী, সাহায্য ও পথপ্রদর্শন চায়। কিন্তু আপনার অধীন থেকে সে যদি এ তিনটি নেয়ামত না পেয়ে শুধুমাত্র ক্রোধ ও কাঠিন্যই পায় তাহলে সে প্রকৃতিগতভাবেই আপনার প্রতি নিরাশ হবে। আপনার নিকট থেকে দূরে থাকার ও গৃহ থেকে পলায়নের চেষ্টা করবে এবং যেখানেই সে এ তিন নেয়ামতের বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে সেখানেই সে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হবে। শিশুরা আসল ও মেকি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজের খারাপ প্রকৃতির মানুষ এ ধরনের শিশুদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর এসব নাদান সন্তান ধীরে ধীরে সমাজের জন্য হয়ে উঠে বিষীষিকাময় এবং বড়ো বড়ো অপরাধ সংঘটন করতে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে এসব শিশু খারাপ মানুষের খারাপ শিকার থেকে যদি পরিত্রাণও পায় তাহলেও তারা মাতা-পিতার স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকে। মাতা-পিতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক হয় না। মাতা-পিতার খারাপ ও দুর্ব্যবহারের পরিণামে শিশুদের অন্তরে মাতা-পিতার জন্য সে পবিত্র আবেগই সৃষ্টি হয় না যা সৌভাগ্যবান সন্তানের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মাতা-পিতা সারা জীবন ধরে তাদের নাফরমানী ও অযোগ্যতার জন্য ক্রন্দন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে বিদ্রোহী বানানোর ব্যাপারে সবচেয়ে গভীর প্রভাব হিসেবে কাজ করে তাদের অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার। আর মাতা-পিতা এজন্য সন্তানদের ঘাড়েই সকল দোষ চাপায়। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, এ অবস্থায় সন্তানের চেয়ে মাতা-পিতার অপরাধ কোনো অংশেই কম নয়।

### একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক বুদ্ধিমান যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মতো লোকের নিকট থেকে পিতা-মাতার সাথে যে ধরনের সম্পর্ক আশা করা যায় তা যেন নেই। এর কারণ কি ? যুবকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তার বর্ণনায় শৈশবকালের বর্ণনা এমন ধরনের ছিলো ঃ

“আল্লাহ আমার পিতাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির জল্লাদের মতো একজন মানুষ। শৈশবকালে আমি তার গোস্বা ও ক্রোধে সবসময় কাঁপতাম। রাতে শুয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠার তেমন আকাঙ্ক্ষা

জাগতো না। আর সকালে ঘুম থেকে উঠে পিতার সামনে আসতে খুবই কুণ্ঠাবোধ করতাম এবং মনে মনে এ আশাই করতাম হায় ! আজকের দিনটি যদি শান্তিতে অতিবাহিত হতো। গালাগালি এবং মারপিট ছাড়া যদি একটি দিন কাটতো। কোনো দিন যদি দিনের বেশীর ভাগ শান্তির সাথে কাটতো তাহলে আমি খুব খুশী হতাম এবং বলতাম আজকের দিনটি বড়ো মুবারক দিন। আমি আজ বেঁচে গেছি। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই আমার আনন্দ ধুলায় মিলিয়ে যেত।

আমার পিতা সফরেও যেতেন। আমি যখন জানতে পারতাম যে তিনি খুব শীঘ্র ফিরে আসবেন তখন খুব দুঃখিত হতাম। হাঁ মাঝে মধ্যে এ খুশীতে অপেক্ষাও করতাম যে তিনি খানা-পিনার জন্য অবশ্যই কিছু আনবেন।

আমার পিতার এ কঠোর স্বভাব এবং পাষাণ হৃদয় দেখে আমি মনে করতাম পিতা মাত্রই এ ধরনের হয়ে থাকেন যখনই কোনো ব্যক্তিকে আমার পিতার থেকে বেশী সুস্থ এবং শক্তিশালী দেখতাম ও সাথে তার এটাও জানতাম যে সে অত্যন্ত বাহাদুর ও ক্রোধান্বিত মানুষ তখন আমার দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকতো না। ভাবতাম, তাহলে তার সন্তানদের যেন কি অবস্থা ! তারা তো জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। সবসময় তারা গালা-গালি, ভয়-ভীতি এবং মারপিট সহ্য করে থাকে। কোনো কোনো সময় আমি সত্যিই কেঁদে ফেলতাম। যখন কারোর পিতাকে অত্যন্ত দুর্বল, রোগগ্রস্ত অথবা অক্ষম এবং অত্যন্ত নরম প্রকৃতির ও মিসকীন স্বভাবের মনে করতাম তখন তার সন্তানদের সৌভাগ্যের জন্য আমার ঈর্ষা হতো এবং ভাবতাম হায় ! আমার পিতাও যদি এ ধরনের দুর্বল, মিসকীন স্বভাব এবং নরম প্রকৃতির হতো তাহলে কতইনা ভালো হতো।"

একথা বলে সে যুবক অনেক্ষণ চুপ করে রইলো। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, পিতা হওয়াও কত বড়ো দায়িত্বের কথা। মাতা-পিতা যদি নিজের সন্তানকে ভালো অবস্থায় দেখতে চায় তাহলে তার নিজের আচরণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কেননা সন্তান মাতা-পিতার নসিহত থেকে ততখানি শিখে না যতখানি তাদের কাজ ও আচরণে শিখে থাকে।

মাতা-পিতার খারাপ ব্যবহার বা অসদাচরণের তৃতীয় খারাপ পরিণাম হলো নৈতিকতার ব্যাপারটি। এ ধরনের মাতা-পিতার সন্তান নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত নীচু স্তরের হয়। দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি বড়ো কিছু করতে চায় তাহলে সে নৈতিকতার দিক থেকে অনেক উন্নতমানের হয়।

কিন্তু মাতা-পিতার নিকট থেকে দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত সন্তানরা সবসময়ই নৈতিক গুণাবলী হতে বঞ্চিত হয়। সে আত্মবিশ্বাস, সাহস, মান-মর্যাদা, অহমবোধ, আত্মপ্রচেষ্টা, খোশ আখলাক, খোশ মেজাজ, খোশ কালাম প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী থেকে মাহরুম থাকে। এর বিপরীত সে রুক্ষস্বভাব অদূরদৃষ্টি, অনুভূতিহীন, বখিলী, নীচতা এবং গর্ব-অহংকারের মতো খারাপ স্বভাবের শিকার হয়। বেশীর ভাগ সময়ই সে নিজের অস্তিত্বকে হেয় এবং অকর্মা মনে করে। সে নিজের এ সকল দোষ স্খলনের জন্য অথবা ঢাকা দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে বড়াই করে থাকে। আপনি যদি সত্যি সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হন তাহলে তাদের অধিকার আদায় করুন এবং তাদের সাথে সে ধরনের আচরণ করুন। যে ধরনের আচরণ আপনি তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করেন। আর তখনই আপনি সন্তানের মতো নিয়ামতের কল্যাণ দেখতে এবং অনুভব করতে পারবেন এবং সন্তানদের গভীর অন্তর থেকে আপনার জন্য এ দোয়া বের হবে ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ بنى اسرئيل : ٢٤

"পরওয়ারদিগার ! আমাদের মাতা-পিতার প্রতি রহম করুন। যেভাবে শৈশবকালে তারা মেহেরবানী ও স্নেহের সাথে আমাদের প্রতিপালন করেছিলেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪

# কুরআন মাজীদে সদাচরণের তাকিদ

কুরআনে সন্তানদের সাথে নরম ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের তাকিদ দেয়া হয়েছে। সন্তানদের ভুল-ত্রুটিতে শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদের উপর রাগ ঝাড়ার জন্য কঠোরতা করা অপসন্দনীয় কাজ। যারা নিজের গৃহের লোকদের সাথে ক্ষমাশীল ব্যবহার করে আল্লাহ্ পাক তাদের ত্রুটি মাফ করে দেন এবং তাদের উপর রহম করেন।

وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ التغابن : ١٤

"আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও নিরতিশয় দয়াবান।"

ইসলাম গ্রহণের পরও কিছু লোক হিজরাতের সৌভাগ্য থেকে মাহরুম ছিলেন। ঘটনা এ ঘটেছিলো যে, তারা যখন মদীনায় হিজরাতের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাদের ঘরের লোকজন তাতে বাধা দিলেন। তারা বললেন, তোমরা মুসলমান হয়েছো তা আমরা বরদাশত করেছি। কিন্তু তোমরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও তা আমরা বরদাশত করতে পারবো না। স্ত্রী ও সন্তানরা ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করে তাদের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করলো এবং তারা হিজরাত করা থেকে বিরত হয়ে গেলো। অতপর যখন তারা মদীনা পৌঁছলো এবং দেখলো যে, যারা সে সময় হিজরাত করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পৌঁছে গিয়েছিলেন তারা দীনের জ্ঞানে তাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে। এতে তারা দুঃখিত হলো। তারা ভাবলো, এ বিরাট ক্ষতির কারণ হলো তাদের বিবি-বাচ্চা। সুতরাং বিবি-বাচ্চাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো। তারা বিবি-বাচ্চাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদের শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করলো। এ সময় কুরআন তাদেরকে হেদায়াত করলো যে, গৃহের লোকজনের নাদানীর কারণে অবশ্যই তোমরা হিজরাতের ফযিলত থেকে মাহরুম হয়েছ। কিন্তু তোমরাই তো তাদেরকে দীনের দাবীর তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়েছো। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও খেয়াল রা !বে যে, তোমরা ঘরের লোকজনদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবে তা কখনই আল্লাহ পসন্দ করবেন না। তাদের সাথে সদাচরণই দীনের দাবী। আল্লাহ স্বয়ং অনেক ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাশীলদেরকেই পসন্দ করেন। তিনি স্বয়ং রহমশীল এবং রহমকারীদেরকেই পসন্দ করেন।

তোমরা যদি আল্লাহর মাগফিরাত এবং রহমাতের আকাঙ্ক্ষা করো তাহলে সন্তানদের সাথে স্নেহ ও মেহেরবানীর আচরণ করো। তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সহনশীল হও এবং মাফ করে দাও।

### আহনাফ বিন কায়েসের নসিহত

আহনাফ আরবের মশহুর সরদার ছিলেন। তিনি শান-শওকত, বিজ্ঞতা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্য আরবে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং বলতেন, এ ব্যক্তি যদি বিগড়ে যায়, তাহলে বুঝবে যে এক লাখ আরব বিগড়ে গেছে।

একবার হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি তাশরীফ রাখলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, আবু বাহার ! সন্তানের সাথে আচরণের ব্যাপারে আপনার রায় কি ?

আহনাফ বিন কায়েস বললেন ঃ "সন্তান আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার ফল এবং কোমরের শক্তি। আমরা তার জন্য জমিনের মতো। যা অত্যন্ত নরম এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিহীন। আমাদের অস্তিত্ব তার জন্য সে আকাশের মতো যা তার উপর ছায়া করে আছে। আমরা তার সাহায্যেই বড়ো বড়ো কাজ আনজাম দেয়ার হিম্মত করি। অতএব, সন্তান যদি আপনার নিকট কিছু দাবী করে তাহলে হৃষ্টচিত্তে তা পূরণ করুন। যদি সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তাহলে তার দুশ্চিন্তা দূর করুন। আপনি দেখবেন যে, সে আপনাকে ভালোবাসবে। আপনার পিতৃসুলভ প্রচেষ্টাকে পসন্দ করবে। আপনি কখনো তার অসহ্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন না। তাতে সে আপনার প্রতি বিরক্ত হবে আপনার মৃত্যু কামনা করবে এবং আপনার নিকটে আসতে ঘৃণা করবে।"

# হাদীসে সদাচরণের গুরুত্ব

সন্তানের সাথে সদাচরণ প্রশ্নে হাদীসেও অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্থিব লাভও বর্ণনা করেছেন এবং আখেরাতের সওয়াব ও পুরস্কারের ব্যাপারেও ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। উপরন্তু এ প্রসঙ্গে মানব সমাজের পক্ষ থেকে যেখানে যেখানে চিন্তার অথবা কর্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হয় সে ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত হিকমতের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাতে সদাচরণের অধিকার আদায় হতে পারে এবং কারো সাথে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি না হয়।

## আচরণের সমতা

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَانِيْ اَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عُمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَاَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عُمْرَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِيْ اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَوُلِدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ، قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ وَرَدَّ عَطِيَّتَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ ـ بخارى، مسلم، مشكوة باب العطايا

"নোমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি তোহফা দিয়েছিলেন। এতে (আমার মা) উমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, তুমি যদি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানাও তাহলে আমি রাজী হবো। অতপর আমার পিতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন, উমরাহ বিনতে রাওয়াহার পক্ষ থেকে আমার যে পুত্র রয়েছে তাকে আমি একটি তোহফা বা উপঢৌকন দিয়েছি। এতে উমরাহ আপনাকে সাক্ষী করার দাবী জানিয়েছে। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই এ ধরনের তোহফা দিয়েছো ?" তিনি বললেন, "না, সবাইকে তো

দিইনি।" অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো।" তিনি বললেন, অতপর তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের সে তোহফা ফেরত নিয়ে নিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি যুলুমের উপর সাক্ষী হই না।" অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বশির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ঃ

اَلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً ؟

"তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের আচরণ করুক এটা কি তুমি পসন্দ করো ?" হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, কেন নয়।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে তুমি এ ধরনের করো না।" –বুখারী ও মুসলিম

এটাতো মানুষের শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার যে, সে নিজের সকল সন্তানের সাথে একই ধরনের ভালোবাসা প্রদর্শন করবে। স্বভাবজাত কারণেই কখনো কোনো সন্তানের দিকে আকর্ষণ বেশী হয়। ভালোবাসায় সাম্য প্রদর্শন কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এটা কোনো মানুষের নিকট থেকে দাবীও করা হয়নি। হাদীসে যে বিষয়ের তাকিদ দেয়া হয়েছে তাহলো আচরণগত ব্যাপার। আপনার সন্তান হবার কারণে সকল সন্তানই সমান এবং আপনার উপর সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং আপনি সকলের সাথেই এক ধরনের সদাচরণ করবেন এবং এ ব্যাপারে একজনকে আরেকজনের উপর অগ্রাধিকার দেবেন না। এক সন্তানকে অপর সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া এজন্যও সঠিক নয় যে, এতে একজনের অধিকার নষ্ট করা হয় এবং অন্য দিকে তাতে সন্তানদের নৈতিকতার উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। যার সাথে বিশেষ ধরনের আচরণ করা হয় তার মধ্যে বড়াইয়ের ভাব সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ভাই-বোনকে নিজের থেকে ছোট মনে করতে থাকে। যেসব সন্তানের সাথে খারাপ আচরণ করা হয় তাদের মধ্যে নিম্নমানের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং মানসিকভাবে সে নিজেকে নীচুমনা ভাবতে শুরু করে। ফলে তার নৈতিক ও দৈহিক প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সাথে সাথে ভালোবাসা, স্নেহ, ত্যাগ ও কুরবানীর আবেগও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ সকল গুণ স্বভাবজাতভাবেই প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের ভাই-বোনদের জন্য হয়ে থাকে। এভাবে মাতা-পিতার জন্য সন্তানদের মধ্যে যে মান-ইজ্জত বোধ থাকে তা আঘাত প্রাপ্ত হয়।

কখনো এ রকমও হয় যে, প্রথম স্ত্রী অথবা প্রথম স্বামীর সন্তান এবং বর্তমান স্ত্রীর সন্তানের মধ্যে সমান আচরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। যে স্ত্রী অথবা স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেছে তার সন্তানের তুলনায় নতুন স্ত্রী অথবা নতুন স্বামীর সন্তানের কদর বেশী করা হয় এবং প্রথম জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সন্তানদের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আপনার অন্তর যদি সে সন্তানের জন্য পরিষ্কার না থাকে অথবা তাদের আচার-আচরণ আপনার পসন্দ না হয় এবং আপনার মন যদি তাদের দিকে না ঝুঁকে তাহলে আপনি মজবুর। কিন্তু ইসলাম আবশ্যিকভাবে আপনার নিকট এ দাবী করে যে, সবকিছু সত্ত্বেও আপনি সবার সাথে সমান আচরণ করবেন। আপনি যদি একজনের জন্য আরাম-আয়েশের সকল উপকরণ সংগ্রহ করে এবং অন্যান্যদেরকে মাহরুম করেন তাহলে আপনি শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরাধী।

আপনি আপনার কাজের ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের অন্তরকে ধোঁকা দিতে পারেন। দুনিয়ার চোখে ধূলা নিক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি থেকে নিজের অপরাধ ঢাকতে পারেন না। তাকে ধোঁকাও দিতে পারেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাজকে যুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং যুলুমের উপর সাক্ষী হওয়াকে তিনি পসন্দ করেননি। অনুগত সাহাবীও তৎক্ষণাৎ নিজের প্রদত্ত তোহফাকে ফিরিয়ে নিয়ে ছিলেন। হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছিল। তিনি উমরাহ বিনতে রাওয়াহার পুত্রকে উপঢৌকন প্রদান করছিলেন, কিন্তু অন্য স্ত্রীর সন্তানদেরকে তা থেকে মাহরুম করছিলেন। অবশ্য যখন তিনি সঠিক ব্যাপার জানতে পেলেন তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের কাজ শুধরে নিলেন এবং বিশেষ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করলেন।

**পুত্র ও কন্যার মধ্যে ভিন্ন ধরনের আচরণ**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ ابو داود

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার

ঘরে কন্যা হলো এবং সে তাকে (জাহেলী যুগের মতো) জীবিত দাফন করলো না, তাকে অপাংক্তেয়ও মনে করলো না এবং ছেলেদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিলো না, তাহলে এ ধরনের লোককে আল্লাহ্ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে যে কাজের জন্য মাতা-পিতাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর তিনটি অংশ রয়েছে ঃ

**এক ঃ** কন্যাকে জীবিত দাফন না করা এবং বাঁচার অধিকার প্রদান করা।

**দুই ঃ** কন্যাকে বেইজ্জতী ও অপদস্ত না করা।

**তিন ঃ** ছেলেকে মেয়ের উপর প্রাধান্য না দেয়া।

প্রথম অংশ অর্থাৎ কন্যাকে বাঁচার অধিকার প্রদান প্রশ্নে মুসলমান সমাজ বাধ্য। ইসলামের আলোক প্রাপ্তির পর কোনো মুসলমান চিন্তাই করতে পারে না যে, কন্যাকে জীবিত দাফন অথবা কোনোভাবে তাকে বাঁচার অধিকার থেকে মাহরুম করতে হবে। অবশ্য কন্যাকে নীচু মনে করা এবং পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু মুসলমান পরিবারের চিন্তা ও কাজে কমতি রয়েছে। এ চিন্তা ও কাজের সংশোধন অত্যাবশ্যক এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী ও উৎসাহ প্রদান সে লক্ষ্যেই পরিচালিত।

অনেক পরিবারে ঘরে ও বংশে পুত্রের যে মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা হয় তা কন্যাকে দেয়া হয় না। পুত্র, পুত্র বধু এবং তার সন্তানদের সাথে যে ভালো আচরণ করা হয় তা কন্যা, জামাই এবং তার সন্তানদের সাথে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে পুত্র ও কন্যার মধ্যে যে পার্থক্যমূলক আচরণ করা হয় তার মূলে এ ধারণাই ক্রিয়াশীল যে, অন্যের জন্য কন্যা প্রতিপালন করা হয় এবং পুত্র প্রতিপালন করা হয় নিজের জন্য। কন্যার নিকট থেকে কোনো ধরনের কিছু আশা করা যায় না এবং পুত্রের কাছে সকল কিছুই আশা করা যায়। কন্যা অন্যের ঘরের সৌন্দর্য এবং আবাদীর মাধ্যম। পক্ষান্তরে পুত্র নিজের ঘরের সৌন্দর্য এবং আবাদীর মাধ্যম। এ ধরনের চিন্তার আবশ্যিক ফল হলো যে, পুত্র প্রতিপালনে যে আন্তরিকতা ও আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে, কন্যারা তা থেকে বঞ্চিত হয়। কন্যা প্রতিপালন এবং তার সাথে আচরণে ফরয আদায়ের অনুভূতি ঠিকই ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ উচ্ছলতা থাকে না। অথচ পুত্র লালন-পালনে এর সকল কিছুই পাওয়া যায়।

নিজের ঘরে কন্যাকে নীচু মনে করা হয় এবং সমাজেও। গৃহে পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং সমাজেও পুত্রদের মর্যাদা বেশী থাকে। মাতা-পিতাও কন্যাকে সে পোশাক, গহনা এবং তোহফা প্রদান করেন না যা পুত্রবধূকে দিয়ে থাকেন। পুত্রবধূকে যাকিছু দিয়ে থাকেন তা আন্তরিক আবেগেই দেন। কারণ সে তো নিজের ঘরের সৌন্দর্য এবং কন্যাকে যাকিছু দেন তা শুধু ফরয আদায় অথবা সমাজে নিজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য দিয়ে থাকেন। পুত্রবধূকে কিছু দিয়ে তা কখনো স্মরণ করেন না। পক্ষান্তরে কন্যাকে কিছু দিয়ে তা স্মরণ করেন এবং সবসময় তার আলোচনা এমনকি খোঁটাও দিয়ে থাকেন। এ ধরনের পরিবারে কন্যা সন্তানরা সে ধরনের অভিভাবকত্ব এবং স্নেহ ভালোবাসা পায় না, যা পুত্রের সন্তানরা পেয়ে থাকে। পুত্রের সন্তানকে ঘরের সন্তান মনে করা হয়ে থাকে এবং কন্যার সন্তানকে অন্যের ঘরের সন্তান মনে করা হয়। বংশ, সমাজ এবং নামকরা ব্যক্তিদের নিকটেও পুত্রের সন্তানদেরকে নিজের ঘরের মানুষ এবং সন্তান হিসেবে সামনে আনা হয়। আর সেভাবেই সমাজে তাদের আচরণ আশা করা হয় কিন্তু কন্যার সন্তানদের সাথে নিজেরাও এ ধরনের আচরণ হয় না এবং সমাজের কাছেও সে মর্যাদার আচরণ আশা করা হয় না। অন্যদিকে সমাজও এ ধরনের মানুষের পুত্রদের সন্তানদের সাথে যেই আচরণ করে থাকে, তাদের কন্যাদের সন্তানদের সাথে সে আচরণ করে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে মুসলমান মাতা-পিতাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এ কর্মপদ্ধতি পসন্দনীয় নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভের পদ্ধতি হলো, মুসলমান মাতা-পিতা, পুত্র এবং কন্যাকে একই ধরনের গুরুত্ব দেবে। উভয়ের সাথে সমান আচরণ করবে। কন্যাকেও ঘরে এবং সমাজে সে মর্যাদা এবং সম্মান দেবে যা পুত্রকে দেয়া হয়। তাছাড়া কোনো ব্যাপারেই পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না এবং সবসময়ই ব্যক্তির রুচি এবং সমাজের রীতি-নীতির চেয়ে দীনের দাবীকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

### কন্যা জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَّاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ
كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ - متفق عليه، رياض الصالحين ص ١٤٤

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার নিকট এক মহিলা দু কন্যাসহ ভিক্ষার জন্য এলো। সে সময় আমার নিকট কিছুই ছিলো না। শুধুমাত্র একটি খেজুর ছিল। খেজুরটি আমি তার হাতে দিলাম। সে খেজুরটি অর্ধেক অর্ধেক করে নিজের দু কন্যাকে দিয়ে দিল এবং স্বয়ং তা চেখেও দেখলো না। অতপর উঠে দাঁড়ালো এবং চলে গেল। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে এলেন তখন আমি এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিকেই এ কন্যার মাধ্যমে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। তাহলে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।"–বুখারী ও মুসলিম

দুনিয়ায় কন্যার নিকট থেকে কোনো বস্তুগত লাভের আশা যদিও ঠিকই নেই তবুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতা ও আখেরাতের উপর আস্থা স্থাপনকারী মাতা-পিতার জন্য কন্যার সাথে সদাচরণের এর চেয়ে বড়ো শক্তি আর কি হতে পারে যে, এ দুর্বল কন্যারাই কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

"প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি এলো। কোলে ছিলো তার শিশু। সে শিশুকে স্নেহভরে আদর করতে লাগলো। তিনি এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর কি তোমার দয়া হয় ? সে বললো, কেন হবে না। তিনি বললেন, তুমি এ শিশুর উপর যত দয়া করো, আল্লাহ তার চেয়ে বেশী তোমার উপর দয়া করে থাকেন। কেননা তিনি সকল দয়াকারীর চেয়ে বেশী দয়াকারী।–আল আদাবুল মুফরিদ

## সন্তানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও এমন নেই যে, যা তাঁর স্ত্রীরা, তাঁর সন্তানরা এবং সাহাবায়ে কিরামরা স্মরণ রাখেননি। এ সকল কিছুই চরিত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। এমনকি তাঁর একান্ত পারিবারিক এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সামান্য সামান্য ঘটনাও লোকজন মনে রেখেছে। একে অপরের নিকট বর্ণনা করেছে এবং তা হাদীস ও সিরাত গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো পবিত্র জীবনে এমন ঘটনা একটিও পাওয়া যাবে না যে, তিনি নিজের কোনো সন্তানকে মেরেছেন কেটেছেন, নরম-গরম কিছু বলেছেন অথবা কোনো ধরনের কঠোর আচরণ করেছেন। মুহাব্বাত, স্নেহ, মেহেরবানী, নরমী, রহম এবং সুন্দর আচরণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কোনো সন্তানের সাথে তাঁর কঠোর আচরণের একটি ঘটনাও নেই। সন্তানের প্রতি তো মানুষের অসাধারণ ভালোবাসা থাকে এবং মেজাজ বিরোধী তাদের অনেক ব্যাপারই মানুষ বরদাশত করে নেয়। কিন্তু এখানে তো অবস্থা ভিন্ন ধরনের। একজন খাদেম দশ দশটি বছর তাঁর নিকট অবস্থান করে। আর তিনি একটি বারের জন্যও তাকে একথা বলেননি যে, "উহ্, এটা কি হচ্ছে ?" হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "প্রায় দশ বছর আমি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে ছিলাম এবং সে সময় আমি ছিলাম কিশোর। এজন্য আমার সব কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্জী মুতাবেক হতো না (এবং হতেও পারে না, দশ-বারো বছরের বালকের আর কিইবা বুদ্ধি থাকতে পারে !) কিন্তু দশ বছরের সে পুরো সময়ে তিনি কখনো আমাকে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি এবং কখনো তিনি একথা বলেননি যে, এটা কেন করেছ এবং এটা কেন করোনি।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর আচরণ এবং ব্যবহারের চিত্র এভাবে এঁকেছেন, "তিনি কখনো কোনো দাসকে, কোনো দাসীকে, কোনো মহিলাকে কোনো পশুকে নিজের হাতে মারেননি এবং যখনই তিনি ঘরে আসতেন তখন অত্যন্ত খুশি ও হাসি এবং মুচকি হাসি দিয়ে আসতেন।

**কন্যার সাথে ভালো আচরণ**

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কন্যার ব্যাপারে বলতেন ঃ "ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে নাখোশ করবে সে আমাকে নাখোশ করবে।"–বুখারী

বিয়ের পর যখনই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখনই তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন। তাঁর কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বাতেন।–আবু দাউদ

যদি কখনো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দুঃখিত দেখতেন তখন স্বয়ং দুঃখিত হয়ে পড়তেন। একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে অত্যন্ত হাসি খুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যখন কন্যার ঘরে ঢুকলেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং যখন ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তখন হাসি খুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন ব্যাপার কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি উভয়ের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহ তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে বেশ দূরে ছিলো। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার গৃহে তাশরীফ নিলেন। কথায় কথায় বললেন, বেটি ! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছ। আমি তোমাকে নিজের নিকটে কোনো বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আব্বাজান ! হারিস বিন নুমানের কয়েকটি বাড়ী আছে। আপনি যদি তাঁকে বলেন, তাহলে তিনি কোনো বাড়ী অবশ্যই দিয়ে দেবেন। আব্বাজান ! আপনি তাঁকে বলুন ! প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বেটি ! তাঁকে বলতে আমি লজ্জা পাই।

কোনোভাবে একথা হারিস বিন নুমান জানতে পেলেন। তিনি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি শুনেছি যে, আপনি আপনার কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের নিকট কোনো বাড়ীতে আনতে চান। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক! আমার সকল বাড়ী আপনার নিকট হাজির করলাম। যে বাড়ীতে ইচ্ছা, আপনি খুশীর সাথে তাঁকে নিয়ে আসুন। আল্লাহর কসম ! যে জিনিসই আপনি আমার নিকট থেকে নেবেন, তা আপনার নিকট থাকা আমার নিকট থাকার চেয়ে আমি বেশী পসন্দ করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। অতপর তিনি প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে হারিস বিন নুমানের একটি বাড়ীতে নিজের নিকটে নিয়ে এলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই সফরে যেতেন তখন সর্বশেষ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে তাশরীফ রাখতেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সফরে রওয়ানা হয়ে যেতেন। এমনিভাবে তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন মসজিদে নফল নামায থেকে ফারিগ হয়ে সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরীফ নিতেন।

নাতীদেরকেও গভীরভাবে ভালোবাসতেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট যখনই যেতেন তখনই বলতেন, ফাতেমা ! আমার শিশুদেরকে আনো। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্রদেরকে তাঁর নিকট আনতেন। তিনি তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যার নাম ছিলো হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি সবার বড়ো ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো খালাতো ভাই আবুল আছের সাথে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়েতে তাঁকে ইয়েমেনী আকিক পাথরের একটি মূল্যবান হার দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন হযরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর স্বামী তখনো ঈমান আনেননি। বরং কাফেরদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিজের মুক্তির জন্য তিনি বাড়ীতে ফিদইয়ার অর্থ প্রেরণের কথা বলে পাঠালেন। বস্তুত হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সে হার প্রেরণ করেছিলেন যে

হার তার আম্মা বিয়েতে দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের কন্যার এ হার দেখলেন তখন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অতপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা সম্মত হলে এ হার যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফিরিয়ে দিতে পার এবং তাঁর স্বামীকেও মুক্তি দিতে পার। সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আবেদন হৃষ্টচিত্তে মঞ্জুর করলেন। আবুল আছকে মুক্ত করে দেয়া হলো। এবং তাঁর স্ত্রীর হারও তার হাওয়ালা করা হলো। কিন্তু শর্ত দেয়া হলো যে, সে মক্কা গিয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার নিকট এসে গেলেন।

কিছুদিন পর আবুল আছও মদীনা এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবুল আছের ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সোয়া বছর জীবিত ছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজের পবিত্র হাতে তাঁকে কবরে নামান। কবরে নামানোর সময় তিনি অত্যন্ত শোকাতুর এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। অতপর আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, পরওয়ারদিগার! এ বড়ো দুর্বল ছিল। পরওয়ারদিগার তুমি তার মুশকিলকে আসান করো এবং তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও।–উসদুল গাব্বাহ

# ভালো নাম রাখা

নামেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও নামের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নাদুস-নুদুস সুশ্রী শিশুদেরকে সবাই আদর করতে চায়। কিন্তু যখন তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় এবং যে কোনো অর্থহীন এবং বিশ্রী নাম বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা দমে যায়। এ সময় প্রাণে চায় যে, আহা ! তার নামও যদি তার সুশ্রীর মতো হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সুন্দর নাম অনুভূতি এবং আবেগের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে কোনো মহিলাকে যদি বিশ্রী এবং খারাপ নামে সম্বোধন করা হয় তাহলে তার ক্রোধমূলক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। খারাপ নামে সম্বোধন করায় তার খারাপ আবেগই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যদি কোনো মহিলাকে সুন্দর নামে ডাকা হয় তাহলে সে মহিলা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ভালোবাসার আবেগে জবাবও দিয়ে থাকে। নিজের ভালো নাম শুনে সে নিজেকে মর্যাদাবান বলে মনে করে।

লোকজন সন্তানকে ভালো নামে ডাকুক, এটাই মাতা-পিতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। ভালো নামে ডাকার ফলে একদিকে যেমন শিশু খুশী হয়। অন্যদিকে যিনি ডাকেন তার অন্তরেও তার জন্য সুন্দর ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটাতো তখনই হতে পারে যখন আপনি আপনার সন্তানের ভালো নাম রাখবেন। আপনার উপর আপনার প্রিয় সন্তানের অধিকার হলো আপনি তার সুন্দর ও পবিত্র নাম রাখবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতকে ভালো এবং পবিত্র নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীরা যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের সন্তানের নাম রাখার জন্য আবেদন জানাতেন তখনই তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাম প্রস্তাব করতেন। কারোর নিকট তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে যদি অর্থহীন এবং অপসন্দনীয় নাম বলতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপসন্দ করতেন এবং তাকে নিজের কোনো কাজ করতে দিতেন না। পক্ষান্তরে সুন্দর ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে তিনি পসন্দ করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের কাজ করতে দিতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে বেরুলে তিনি 'ওয়া নাজিহ' অথবা 'ইয়া রাশেদ'-এর মতো বাক্য শুনতে ভালোবাসতেন। যখন কাউকে কোনো স্থানের দায়িত্বশীল বানিয়ে প্রেরণ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সে

তার নাম বললে, তাঁর পসন্দ হলে খুব খুশী হতেন এবং খুশীর আলামত তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। যদি তার নাম তিনি অপসন্দ করতেন তাহলে তার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠতো। যখন কোনো বস্তিতে প্রবেশ করতেন তখন সে বস্তির নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি সে বস্তির নাম তাঁর পসন্দ হতো তাহলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। অধিকাংশ সময় এটাও হতো যে তিনি অপসন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিতেন। খারাপ নাম তিনি কোনো বস্তুর জন্যই সহ্য করতে পারতেন না। মানুষরা একটি স্থানের নাম হুজরাহ্ অর্থাৎ বাঁজা বা বান্ধা বলে ডাকতো। তিনি সে স্থানের নাম খুজরাহ অর্থাৎ চির-সবুজ ও শস্য-শ্যামল রেখে দিলেন। একটি ঘাঁটিকে গুমরাহির ঘাঁটি বলা হতো। তিনি তার নাম হেদায়াতের ঘাঁটি রাখলেন। এমনিভাবে তিনি অনেক পুরুষ এবং মহিলার নামও পরিবর্তন করে দেন। যে ব্যক্তি তাঁর পরিবর্তিত নামের পরিবর্তে পুরাতন নাম সম্পর্কেই পীড়াপীড়ি করতো তাহলে সে তার পুরাতন নামের খারাপ প্রভাব নিজের ব্যক্তিত্বের উপরও অনুভব করতো এবং বংশধরদের উপর তার খারাপ প্রভাব অবশিষ্ট থাকতো।

## সন্তানের জন্য পসন্দনীয় নাম

আপনার শিশুর জন্য পসন্দনীয় নাম বলতে সেসব নাম বুঝায় যাতে কিছু বিষয়ে নজর দেয়া এবং কিছু বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

**এক** ঃ আল্লাহর জাত অথবা ছিফাতি নামের সাথে আবদ অথবা আমাতাহু শব্দ মিলিয়ে বানানো হয়েছে। যেমন, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুল গাফ্ফার, আমাতাহুল্লাহু, আমাতাহুর রাহমান প্রভৃতি। অথবা এমন নামে হবে যা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসার প্রকাশ ঘটে।

**দুই** ঃ কোনো পয়গাম্বরের নামানুসারে নাম রাখা। যেমন ঃ ইয়াকুব, ইউসুফ, ইদরিস, আহমদ, ইবরাহিম, ইসমাঈল ইত্যাদি।

**তিন** ঃ কোনো মুজাহিদ, ওলি এবং দীনের খাদেমের নামানুসারে নাম রাখা, যেমন ঃ ওমর ফারুক, খালিদ, আবদুল কাদের, হাজেরা, মরিয়ম, উম্মে সালমাহ, সুমাইয়া ইত্যাদি।

**চার** ঃ নাম যেন আপনার দীনি আবেগ ও সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব হয়। উদাহরণ স্বরূপ মিল্লাতের বর্তমান দূরবস্থা দেখে আপনি আপনার শিশুর নাম ওমর এবং সালাহ উদ্দিন প্রভৃতি রাখতে পারেন এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারেন যে, আপনার শিশু বড়ো হয়ে মিল্লাতের ডুবন্ত তরীকে তীরে ভিড়িয়ে দেবে এবং দীনকে পুনর্জীবিত করবে।

**পাঁচ ঃ** কোনো দীনি সফলতা সামনে রেখে নাম প্রস্তাব করা। যেমন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে এ আয়াত সামনে এলো ঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ـ

"যখন সেদিন আসবে, যেদিন তুমি কারোর সাথে কথা বলার শক্তি রাখবে না। হ্যাঁ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে লোক কথা বলতে পারবে। অতপর সেদিন কিছু মানুষ হতভাগা হবে এবং কিছু মানুষ ভাগ্যবান হবেন।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতি দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক গ্রুপ হবে হতভাগা এবং অপর গ্রুপ হবেন সৌভাগ্যবান।

এ আয়াত পড়ে, অযাচিতভাবে, আপনার অন্তর থেকে দোয়া হলো যে, হে পরওয়ারদিগার আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সে ভাগ্যবানদের দলের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং অতপর আপনি আপনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার নাম রাখলেন সাঈদ।

প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার ইচ্ছা, আবেগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মুতাবেকই চেতনা অথবা অবচেতনভাবে নাম প্রস্তাব করে থাকেন এবং এসব আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই শিশু বড়ো হতে থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবে সাধারণ অবস্থায় যে আপনার স্বপ্নের বাস্তবায়নই করে থাকে।

এসব বিষয় নাম প্রস্তাব করার সময় সামনে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আবার কিছু বিষয় এমন আছে যা নাম প্রস্তাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করার রয়েছে।

**এক ঃ** এমন চিন্তা ও অনুভূতি যা ইসলামী আকীদা এবং আদর্শের পরিপন্থী। বিশেষ করে যে নামে তাওহীদি ধ্যান-ধারণায় আঘাত লাগে। যেমন নবী বখশ, আবদুর রসূল ইত্যাদি।

**দুই ঃ** কোনো এমন শব্দ যা দিয়ে গর্ব অহংকার অথবা নিজের পবিত্রতা ও বড়াই প্রকাশ পায়।

**তিন ঃ** এমন নাম যা অনৈসলামিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় এবং আল্লাহর রহমাত প্রাপ্তির কোনো আশা করা যায় না।

## ভালো নাম রাখার হেদায়াত ও হিকমত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ ، وَاَسْمَاءِ اٰبَاءِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ ـ ابو داود عن ابى الدردا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব ভালো নাম রাখো।"

**আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নাম**

عَنْ اَبِىْ وَهَبٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُسَمُّوا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ ـ الادب المفرد وجمع الفوائد ج ٢ ص ٤٠٦ بحو اله ابوا داود ونسائى

"হযরত আবু ওয়াহাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নবীদের নামে নাম রাখো এবং আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। প্রিয় নাম হলো হারেছ এবং হাম্মাম এবং অত্যন্ত অপসন্দনীয় নাম হলো হারব ও মুররাহ।"

'আল্লাহ' শব্দ আল্লাহর জাতি নাম। রহমান ইসলামের আল্লাহর জাতি নাম নয়। অবশ্য ইসলামের পূর্বে কতিপয় জাতির মধ্যে এটা আল্লাহর জাতিনাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এজন্যে তারও অন্যান্য গুণের বা ছিফাতের তুলনায় গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসে শুধু এ দু নামের উল্লেখ্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এ দু নামই রাখা যাবে এবং শুধু এ আল্লাহর নিকট পসন্দনীয়। বরং এটাকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর কোনো সিফাতের সাথে আবদ শব্দ লাগিয়ে নাম রাখা হলে তাই আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নাম। সম্ভবত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র এ দু নামের উল্লেখ এজন্যেও করে থাকতে পারেন যে, পবিত্র কুরআনে আবদের সম্বন্ধের সাথে এ দু নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

হারিছ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কৃষি এবং আয়ের কাজে লেগে থাকে, যদি সে হালাল উপায়ে দুনিয়া কামাই করে তাহলেও উত্তম আর যদি সে পরকাল কামাইয়ে লেগে থাকে তাহলে তার থেকে উত্তম আর কি হতে পারে।

**হাম্মাম ঃ** সুদৃঢ় ইচ্ছাকারী ব্যক্তিকে বলা হয়, যে এক কাজ শেষে অন্য কাজে লেগে যায়।

হারব ঃ যুদ্ধকে বলা হয়, এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, যুদ্ধ কোনো পসন্দনীয় কাজ নয়।

মুররাহ ঃ তেতো জিনিসকে বলা হয়, আর তেতো বস্তুতো সবার নিশ্চয়ই অপসন্দনীয়।

## ভালো নামে শুভ সূচনা

হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক উটনী দোহানোর জন্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَنْ يَّحْلُبُ هٰذِهٖ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مُرَّةُ، فَقَالَ لَهٗ : اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَّحْلُبُ هٰذِهٖ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهٗ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهٗ اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّحْلُبُ هٰذِهٖ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ ؟

قَالَ : يَعِيْشُ فَقَالَ لَهٗ اُحْلُبْ ـ جمع الفوائد بحواله مؤطا امام مالك رحـ

"এ উটনীকে কে দোহন করবে ? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে বললো, তার নাম হলো মুররাহ। তিনি বললেন, বসো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ উটনীকে কে দোহন করবে ? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে বললো, তার নাম হারব। তিনি বললেন, বসে যাও। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ উটনীকে কে দোহন করবে ? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? সে বললো, তার নাম ইয়ায়িশ। তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি দুধ দোহন কর।–জাময়ুল ফাওয়াদে বাহাওয়ালা মুয়াত্তা ইমাম মালিক

প্রথম দু নামের ভাবার্থ অপসন্দনীয় এবং সর্বশেষ নামের ভাবার্থ পসন্দনীয়। ইয়ায়িশ শব্দ জীবন্ত থাকার অর্থবোধক।

এমনিভাবে ইমাম বুখারীও একটি হাদীস নকল করেছেন।

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের এ উটকে কে হাকিয়ে নিয়ে যাবে ? অথবা তিনি

বলেছিলেন, "কে তাকে পৌঁছাবে ?" এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ?" সে বললো, আমার নাম হলো এই। তিনি বললেন, "বসে যাও।" অতপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ?" তিনিও বললেন, "আমার নাম এই।"তিনি বললেন, "বসে যাও।" অতপর তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়ালো। তার নিকটও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ?" সে বললো, তাঁর নাম নাজিয়াহ্।" এ সময় তিনি বললেন, "তুমি এ কাজের উপযুক্ত। হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।"

## হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি কৌতুক

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি ? সে বললো, "অঙ্গার।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পিতার নাম কি ? সে বললো, "অগ্নি শিখা।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ কবিলার ? বললো, 'জ্বলন" কবিলার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ী কোথায় ? বললো, "আগুনের গরম টিলার উপর।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আগুনের কোন্ টিলার উপর ? বললো, প্রজ্জ্বলিত টিলার উপর।" একথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জলদী যাও। ঘরের মানুষদের খবর দাও। তারা সবাই পুড়ে গেছে। ঠিক তাই হয়েছিল যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন।–জাময়ুল ফাওয়ায়েদ

## নামের সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلاَ تَضْرِبُوْهُ وَلاَ تَحْرِمُوْهُ ـ

"যখন তোমরা কারোর নাম মুহাম্মাদ রাখবে তখন তাকে তোমরা মারবে না এবং বঞ্চিত করবে না।"–জাময়ুল ফাওয়ায়েদ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

تُسَمُّوْنَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تَلْعَنُوْنَهُمْ ـ

"তোমরা শিশুদের নাম মুহাম্মাদও রাখবে আবার তাকে অভিশাপ ও গালাগালও দেবে।"

অর্থাৎ এ নামের সম্মানে শিশুদের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করবে না। এমনিতেই শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ অপসন্দনীয় কাজ। আর

যদি শিশুর নাম মুহাম্মাদ হয় তাহলে আরো বেশী খেয়াল রাখতে হবে। কেননা এ নামের সম্মান প্রদর্শনও আবশ্যক।

## নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাবিত কতিপয় নাম

**এক ঃ** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের পুত্র হযরত ইউসুফ বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাম ইউসুফ রেখেছেন। আমাকে তাঁর কোলে চড়িয়েছেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়েছেন।

**দুই ঃ** হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার প্রথম সন্তান জন্ম হলে আমি তাকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং খায়ের ও বরকতের দোয়া দিয়ে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন।

**তিন ঃ** হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও নিজের তিন পুত্রের নাম রেখেছিলেন হারব। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নাম পরিবর্তন করে হাসান, হুসাইন এবং মুহসিন রাখেন।

## নাম পরিবর্তন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। কোনো দিক দিয়ে কারোর নাম যদি খারাপ মনে হতো তাহলে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন এবং কোনো ভালো নাম প্রস্তাব করতেন। যদি কোনো নামে তাওহীদের ধ্যান-ধারণা বিরোধী কোনো অর্থ প্রকাশ পেতো অথবা তা অর্থহীন হতো অথবা তা কোনো অপসন্দনীয় এবং খারাপ বস্তুর নাম হতো অথবা তাতে কোনো অপসন্দনীয় অর্থ হতো অথবা তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত দিক থেকে কোনো গুনাহর সম্পর্ক হতো অথবা তাতে নিজের বড়াই এবং আত্মগরিমা প্রকাশ পেতো এবং অথবা অন্য কোনো খারাপ দিক হতো তাহলে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন এবং তার পরিবর্তে কোনো ভালো ও পবিত্র নাম প্রস্তাব করতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।
—জামে' তিরমিযী

**এক ঃ** হানি ইবনে যায়েদ এক প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি শুনলেন যে, তার কুনিয়ত হলো আবুল হাকাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে বললেন, "হাকাম" তো আল্লাহ্ এবং লুকম প্রদান তার অধিকারের আওতাধীন। তুমি "হাকাম" কুনিয়ত কি করে রাখলে ? ইবনে যায়েদ বললেন, কথা তা নয়। (আমি আল্লাহর সে অধিকারে শরীক হতে চাই) প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার কওমের লোকদের মধ্যে যখন কোনো কথায় পরস্পর মতভেদ হয়ে যায় তখন তারা আমার নিকট আসে। আমি তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দিই এবং উভয় পক্ষ সে সিদ্ধান্ত আনন্দের সাথে মেনে নেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি সুন্দর বিষয় তুমি বর্ণনা করেছ। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো সন্তান নেই ? ইবনে যায়েদ বললেন, তার তিন পুত্র আছে। তাদের নাম হলো শুরাইহ, আবদুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে বড়ো কে? ইবনে যায়েদ বললো, "শুরাইহ" সকলের বড়ো। তিনি বললেন, তাহলে তোমার কুনিয়ত হলো আবু শুরাইহ এবং তার ও তার পুত্রদের জন্য দোয়া করলেন। উপরন্তু আপনি জানতে পারলেন যে, সে প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তির নাম হলো আবদুল হাজার। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ?" সে বললো, "আবদুল হাজার।" তিনি বললেন না, তোমার নাম হবে "আবদুল্লাহ।"

শুরাইহ বলেন, হানি ইবনে যায়েদ যখন স্বদেশ ফিরতে লাগলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! কোন্ কাজ করলে অবধারিতভাবে জান্নাত পাব, তা আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন, দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা করো। মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলো এবং খুব করে খাদ্য বণ্টন করো।–আল আদাবুল মাফরুজ

**দুই** : হযরত আবদুর রহমান বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? আমি বললাম, আমার নাম "আবদুল উজ্জা" তিনি বললেন, না তোমার নাম "আবদুর রহমান।" অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, আমি বললাম, "আমার নাম আজীজ।" এতে তিনি বললেন, "আজিজ তো আল্লাহ।"–আল আদাবুল মাফরুজ

**তিন** : হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছিয়া নাম পরিবর্তন করে, বললেন, তোমার নাম জামিলাহ।–আল আদাবুল মাফরুজ

সহীহ্ মুসলিমের রাওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যার নাম ছিলো আছিয়াহ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবর্তন করে তার নাম রেখেছিলেন জামিলাহ।

**চার ঃ** হযরত মুহাম্মদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন আবু সালমার কন্যা যয়নবের [সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালমার কন্যা ছিলেন। প্রথম স্বামী আবু সালমার পক্ষের কন্যা] নিকট গেলেন। এ সময় যয়নব আমার সাথের কার বোনের নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে বললাম, তার নাম বাররাহ্। সে বললো, তার নাম পরিবর্তন করে দাও। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাদী যখন যয়নব বিনতে জাহ্শের সাথে হয়েছিল তখন তাঁর নাম ছিলো বাররাহ্। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রেখেছিলেন। তখন তার মা তাকে বাররাহ্ বাররাহ্ বলে ডাকছিলো। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিজের পবিত্রতার ডংকা বাজিও না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তোমাদের মধ্যে কে নেককার ও কে বদকার এবং বললেন, তার নাম যয়নব রাখো। আমার মা উম্মে সালমা বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তার নাম যয়নব রাখা হলো।

**পাঁচ ঃ** হযরত রায়েতা বিনতে মুসলিম বলেন, আমার পিতা মুসলিম আমাকে বললেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি বললাম, আমার নাম গুরাব (কাক)। তিনি বললেন, না তোমার নাম মুসলিম।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উল্লেখ করলেন যে, তাকে শিহাব বলা হয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না বরং তুমি হিশাম।

**ছয় ঃ** ইসলামের পূর্বে আবদুর রহমান বিন সাঈদ মাখজুমীর পুত্রের নাম ছিল "আছ-ছরম।" অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পরিবর্তন করে "সাঈদ" রেখে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাঈদকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের উভয়ের মধ্যে বড়ো কে ? আমি, না তুমি ?" হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আপনি আমার থেকে বড়ো আমি আপনার থেকে বয়সে আগে।"

তিনি যখন অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি জুমায়ার নামায এবং জামায়াতের নামাযে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। তিনি বললেন, আমাকে পৌঁছাবে এমন কে আছে ? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন গোলাম তার পথপ্রদর্শন ও খিদমতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

**সাত :** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিজের সন্তানের নাম হুবাব রেখো না। কেননা, শয়তানের নাম হুবাব। সন্তানের নাম হুবাব হতে পারে না। বরং সন্তানের নাম হলো আবদুর রহমান।

সাপকে হুবাব বলা হয় এবং দুনিয়াকে উম্মে হুবাব বলা হয়ে থাকে। এজন্যে তিনি হুবাব নাম রাখতে নিষেধ করেন।

### খারাপ নামের খারাপ প্রভাব

মদীনার মশহুর তাবেয়ী মুহাদ্দিস হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব নিজের দাদা হুরুন-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, একবার সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি ?" তিনি বললেন, "আমার নাম হায়ন।" তিনি বললেন না, "তোমার নাম হায়ন নয় বরং তোমার নাম হলো সাহালা।" হায়ন বললো, আমি তো নিজের পিতা প্রদত্ত নাম পরিবর্তন করে দ্বিতীয় কোনো নাম রাখবো না।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন, এ কারণেই আমাদের বংশে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে দুঃখ চলে আসছে।

### আল্লাহর নিকট সবচেয়ে খারাপ নাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْنَى الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْاَمْلَاكِ ـ الادب المفرد

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট চূড়ান্ত খারাপ ও ক্রোধ সম্বলিত নাম হলো কোনো ব্যক্তিকে মালিকুল আমলাক নামে ডাকা।"

মালিকুল আমলাক শব্দের অর্থ হলো, বাদশাহদের বাদশাহ। ফারসীতে তার অর্থ হলো শাহানশাহ। অর্থের দিক থেকে এটা অত্যন্ত খারাপ নাম।

কেননা এতে শিরকের ইঙ্গিত রয়েছে। ক্ষমতা এবং বাদশাহী এককভাবে আল্লাহর অধিকারভুক্ত। এ অধিকারের অন্য কারো অংশীদার নেই। সহীহ মুসলিমে এ শব্দও রয়েছে। এর অর্থ হলো বাদশাহী এবং ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

## সম্বোধককে তার পসন্দনীয় নামে ডাকা

কারোর নাম নিয়ে যখন আপনি ডাকেন তখন আপনি তার পসন্দনীয় নামসহও ডাকতে পারেন। এজন্য সবসময় অন্যদেরকে সে নামেই ডাকুন যা তার নিকট পসন্দনীয়। এতে সম্বোধক নিজের ইজ্জত বৃদ্ধি অনুভব করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অত্যন্ত পসন্দ করতেন যে, যে নাম এবং কুনিয়াত যে ব্যক্তির নিকট সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয় তাকে সে নামে এবং কুনিয়াতে ডাকতে হবে।

## হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রিয় নাম

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন জামাতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে গেলেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা গৃহে একাকী ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন না। কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের চাচার পুত্র কোথায়?" কন্যা জানালেন, "আমার এবং তার মধ্যে রাগারাগি হয়েছে। সে আমার উপর বিগড়ে গেছে এবং ক্রোধান্বিত হয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। দুপুরের খাওয়ার পর সে এখানে বিশ্রামও নেয়নি।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে বললেন, "একটু দেখে এসোতো আলী কোথায়?" লোকটি বললো, "সে মসজিদের দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুয়ে রয়েছে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পেছনে পেছনে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। চাদরও ঠিক-ঠাক নেই এবং শরীরে মাটি লেগে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন, "আবু তুরাব ! উঠে বসো।"

## আদরের সাথে সংক্ষিপ্ত নাম উচ্চারণ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো সময় আদর করে পুরো নাম উচ্চারণের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত নামও নিতেন। যেমন আয়েশার পরিবর্তে আয়েশ এবং ওসমানের পরিবর্তে ওস্‌ম।

স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য স্বভাবত আপনিও কোনো কোনো সময় এমন করে থাকেন। এতে দোষণীয় কিছু নেই। কেননা এ কাজ নাম বিগড়ানোর জন্য করা হয় না বরং ভালোবাসার আবেগ প্রকাশের জন্য হয়ে থাকে। হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন ঃ

اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا عَائِشُ ! هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُ عَلَيْكَ السَّلَامَ" قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالاَ اَرٰى -

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে আয়েশা ! ইনি জিবরাঈল। তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।" এ সময় আয়েশা বললেন, "তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।" এবং বললেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব দেখছিলেন যা আমি দেখছিলাম না।"–আল আদাবুল মাফরুজ

কখনো যদি কারো নাম স্মরণ না থাকে এবং তাকে ডাকার প্রয়োজন হয় তাহলেও তাকে কোনো বিশ্রী অথবা খারাপ নামে সম্বোধন করবেন না। কোনো ভালো শব্দ প্রয়োগ করে নিজের দিকে ডাকুন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সময় কারোর নাম স্মরণ থাকতো না তখন তিনি হে আবদুল্লাহর পুত্র ! বলে সম্বোধন করতেন।

# সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের একটি অধিকার। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা দেখানো একটি সহজাত ব্যাপার। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরে এ সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের সীমাহীন ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করে আল্লাহও মাতা-পিতার প্রতি অসামান্য ইহসান করেছেন। অন্যদিকে এটা সন্তানের প্রতিও ইহসান। সন্তানের প্রতি ইহসান এ কারণে যে, তাছাড়া সন্তানের লালন-পালন সম্ভবই নয়। বরং তা বেশীর ভাগই অসম্ভব ছিল। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর বাচ্চার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায়, মজবুর, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি তার জন্য স্নেহ ও ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ না হতো তাহলে তার লালন-পালনই হতো না। মাতা-পিতার নজিরবিহীন স্নেহ-ভালোবাসা এবং অসাধারণ ত্যাগ কুরবানীর বদৌলতেই সে বড়ো হয়ে উঠে এবং যোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে মাতা-পিতার প্রতি ইহসান এজন্য যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তান প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ অধিকার মাতা-পিতা কখনই আদায় করতে পারতো না, যদি তাদের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার বিরাট আবেগ সৃষ্টি না হতো।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর রহমাত এবং হিকমতের নিদর্শন এবং তিনি রব বা প্রতিপালক হবার প্রকাশ্য দলিল। কোনো বৈষম্য ছাড়া আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষই নয়, বরং জীব-জন্তুদেরকেও আল্লাহ এ আবেগ দান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে নিজের বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে থাকে।

## মুসলমান মাতা'র ভালোবাসার পার্থক্য

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা একটি সহজাত আবেগ। এজন্য ধর্ম ও আদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজের সন্তানকে স্নেহ করে থাকে। কোনো মাতা-পিতা যদি ধর্ম এবং স্রষ্টায় বিশ্বাসী নাও হয়, তবুও সে সন্তানকে ভালোবাসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলমান মাতা-পিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এ বৈশিষ্ট্য ইসলাম বঞ্চিত মাতা-পিতা কখনই লাভ করতে পারে না। সন্তানকে ভালোবেসে একজন অমুসলিম মা-ও নিজের সহজাত আবেগ পূরণ করে। আবার একজন মুসলমান মা-ও এ আবেগই

পূরণ করে থাকে। কিন্তু মুসলমান মা'র পৃথক বৈশিষ্ট্য হলো যে, সন্তানকে সে এ অনুভূতিতে ভালোবাসে যে, এটা সন্তানের অধিকার, দীনের দাবী এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের সুন্নাত। সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন শুধুমাত্র প্রকৃতিগত আবেগ পূরণেই নয় বরং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টিকরণ, আখেরাতে প্রতিদান পাওয়া এবং পরকালীন মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। এ সুতীব্র অনুভূতির কারণে মুসলমান মায়ের অন্তরে বিরাট আবেগ ও অসাধারণ শক্তির সঞ্চালন হয় এ অনুভূতি সম্পন্ন ভালোবাসা শুধুমাত্র প্রকৃতিগত ভালোবাসার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। দীনি অনুভূতিতে আবেগাপ্লুত ভালোবাসা পোষণকারী মা'র ভালোবাসা অন্ধ ভালোবাসা হতে পারে না। সে দীনের হেদায়াত অনুযায়ী সন্তানকে ভালোবেসে থাকে এবং কখনো আবেগবশত সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে বসে না যা তার এবং সন্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

### সন্তান পরীক্ষার মাধ্যম

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন সন্তানের অধিকার আবার এটা মাতা-পিতার পরীক্ষার মাধ্যমও। আল্লাহ সন্তানের প্রতি ভালোবাসার সহজাত আবেগ প্রদান করে সে আবেগের পৃষ্টপোষকতাও করেছেন এবং সাথে সাথে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেও বলা হয়েছে যে, সন্তানের ব্যাপারে হুশিয়ার থেকো। কেননা কোনো কোনো সময় এ সন্তানই মানুষের শত্রু হয়ে যায়। তাদের প্রতি অহেতুক ভালোবাসার জালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ভারসাম্য খুইয়ে বসে এবং দীন থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। তাদের জন্য সে অন্যের হক বা অধিকার কেড়ে নেয়। হালাল-হারামের পার্থক্য খুইয়ে বসে। আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। ঈমান ও ইসলামের দাবীসমূহ ভুলে যায়। বড়ো বড়ো নেক কাজ থেকে পিছিয়ে যায় এবং ভুল পথে পড়ে নিজের পরকাল ধ্বংস করে বসে। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, সন্তান সম্পর্কে হুশিয়ার থেকো। কিছু কিছু সন্তান এ দিক থেকে মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ع

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। এজন্যে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪

সন্তান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের অর্থ হলো, মানুষ তাদের ভালোবাসায় এমনভাবে যেন আবদ্ধ হয়ে না পড়ে যাতে সে দীন ও

ঈমানের দাবীসমূহ থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যদি দীনের রাস্তায় অগ্রসর হওয়া এবং দীনের খাতিরে কুরবানী প্রদানে বাধা প্রদান করে তাহলে তা হবে শত্রুতা, এজন্য মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো সময়ই যেন তাদের প্রতি ভালোবাসা দীনের প্রতি ভালোবাসার উপর বিজয়ী হতে না পারে। এবং তাদের কারণে মানুষ দীনি ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে না পড়ে। হিজরাতের পূর্বে কিছু মানুষ মক্কায় ঈমান এনেছিলো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও হিজরাতকারী মুসলমানদের সাথে মদীনায় হিজরাত করতে পারেননি। মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও হিজরাতের সৌভাগ্য থেকে শুধুমাত্র এজন্য বঞ্চিত ছিলেন যে, তারা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি অহেতুক ভালোবাসায় ফেঁসে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মদীনা গমন থেকে বিরত রেখেছিল। এ সকল মুসলমান 'হিজরাতের' মতো সৌভাগ্য থেকে এজন্য বঞ্চিত ছিলেন যে, তারা সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার প্রশ্নে সতর্ক ছিলেন না এবং সন্তানের ভালোবাসায় এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, দীনের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন এ অর্থে সন্তানকে ফিতনা ও পরীক্ষা বলেও অভিহিত করেছে। একদিকে তাদের প্রতি প্রকৃতিগত ভালোবাসার আবেগ অন্যদিকে দীন ও ঈমানের দাবী। তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিও তাকিদ দেয়া হয়েছে। আবার সাথে সাথে এ সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে যে, সন্তান পরীক্ষার মাধ্যম। এজন্যে তাদের ভালোবাসায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ো না যাতে দীন ও ঈমানের দাবীসমূহ ভুলে বসতে পারো ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط ـ (التغابن : ١٥

"ঘটনা এই যে, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫

অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ المنافقون : ٩

"হে ঈমানদাররা ! তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল না করে দেয় এবং যে এটা করবে সে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"–সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, মুনাফিকরা সম্পদ ও সন্তানের ভালোবাসায় ফেঁসে গিয়েছিল। বস্তুগত আকাঙ্ক্ষায় তারা বিভোর ছিল এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে ভুলে বসেছিল। আর এটাই সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যে, মানুষ নশ্বর জগতের জন্য চিরকালীন জীবনের সীমাহীন নেয়ামতসমূহ থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। এজন্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু লাল রংয়ের জামা পরে মসজিদে এসে উপস্থিত। তারা খুবই ছোট ছিলেন। কোনো মতে পায়ের উপর ল্যাচৎ খেতে খেতে তারা আসছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা সহ্য করতে পারলেন না। মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন। নাতিদ্বয়কে কোলে উঠিয়ে নিজের নিকটে এনে বসালেন। অতপর বললেন, আল্লাহ সত্যি বলেছেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - التغابن : ١٥

"বাস্তব কথা হলো তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫

হযরত খাওলা বিনতে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বড়ো নেক্কার মহিলা ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিলেন। তিনি নিজের কোনো নাতিকে কোলে নিয়েছিলেন এবং তাকে বলছিলেন, "তোমরাই মানুষকে বখিল বানিয়ে দাও, তোমরাই মানুষকে বুযদিল বানিয়ে দাও এবং তোমরাই মানুষকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্যে নিক্ষেপ করো।"–জামে তিরমিযী

সত্য কথা হলো, সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তাদের কারণেই তার বীরত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে ভীরুতে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রযাত্রা থেকে সে হতচকিয়ে যায়। আল্লাহ না করুন পরিণাম যদি খারাপ হয় তাহলে সন্তানদের কি হবে। তাদের প্রয়োজনকে খেয়াল রেখে খুব সতর্কতার সাথে খরচ করে এবং তাদের কারণেই আবেগের ফেরে পড়ে কোনো কোনো সময় মূর্খ ও নাদানের মতো কাজ করে বসে।

ইসলাম সন্তানের প্রতি ভালোবাসার আবেগকে খাটো করেও দেখে না এবং তাতে বাধাও প্রদান করে না বরং তাকে প্রিয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ আখ্যায়িত

করে তাতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্যই ইসলাম এ ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে তাকিদ দেয় যে, মুসলমান নিজের সন্তানকে দীনের আলোকে ভালোবাসবে। এ ব্যাপারে দীনের হেদায়াতসমূহকে আবশ্যিকভাবে সামনে রাখবে এবং এমন কোনো ভূমিকা অবশ্যই গ্রহণ করবে না যা আল্লাহ অপসন্দ করেন।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِىْ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَااِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ ـ بخارى، مسلم

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু সাইফ কামারের বাড়ী গেলাম। আবু সাইফ নবী পুত্র হযরত ইবরাহীমের দুধ মাতার স্বামী ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পুত্রকে কোলে নিলেন। তাকে আদর করলেন এবং তাকে শুঁকলেন এবং (অর্থাৎ তার মুখের উপর নিজের নাক এবং মুখকে এমনভাবে রাখলেন এবং যেন শুঁকলেন)। অতপর যখন আমরা সেখানে গেলাম তখন হযরত ইবরাহীমের শ্বাস বেরিয়ে গেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি চক্ষু দিয়ে অশ্রু টপ টপ করে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনিও কাঁদছেন ? তিনি বললেন, ইবনে আওফ ! এ অশ্রু রহমাতের নিদর্শন এবং তার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায় এবং অন্তরে লাগে দুঃখ। আমরা যবান দিয়ে শুধু তাই বলি, যা আমাদের পরওয়ারদিগার পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম ! আমরা তোমার বিচ্ছিন্নতায় শোকাভিভূত।"

## সন্তানের সাথে রুক্ষ ব্যবহার

কিছু কিছু লোক সন্তানের সাথে হাসা ও খেলা করা, তাদের নিয়ে মশগুল থাকা, তাদেরকে কোলে নিয়ে খাওয়ানো, চুমু দেয়া এবং আদর করাকে দীনদারির খেলাফ মনে করে থাকে। তাদের নিকট দীনদারি এবং গাম্ভির্যের দাবী হলো, সন্তানের সাথে হাসি-খুশীর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। সন্তান থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। তাদের সাথে মেলামেশা করার পরিবর্তে সম্পর্কহীনতা দেখাতে হবে এবং ভালোবাসা প্রকাশের চেয়ে কঠোরতা ও রুক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। ইসলাম এ ধরনের ধ্যান-ধারণার কখনই পৃষ্ঠপোষকতা করে না। এটা দীনি ধ্যান-ধারণা এবং দীন সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবের পরিণতি। এর বিপরীত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়াত এবং তাঁর আমল থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন একটি পসন্দনীয় কাজ। সে ব্যক্তির অন্তর দয়া ও মায়া থেকে অবশ্যই শূন্য, যে নিজের সন্তানকে ভালোবাসে না। সন্তান চক্ষু শীতলকারী। তাদের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসা প্রদর্শন পরকালীন সাফল্যের মাধ্যম হবে। আর এ থেকে বঞ্চনার অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চনা।

## সন্তানকে চুম্বন দান আল্লাহর রহমাতের কারণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ الاَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيْمِىْ جَالِسٌ فَقَالَ الاَقْرَعُ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَّيَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ -

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাতি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা বিন হাবিসও সেখানে বসেছিলেন। বলতে লাগলেন, আমার তো ১০টা বাচ্চা। কিন্তু আমি তো কখনো কোনো একটি বাচ্চাকেও আদর করিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "যে রহম করে না, আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না।"

অর্থাৎ নিজের সন্তানকে চুমু দেয়া এবং আদর করা রহম ও মেহেরবানীর নিদর্শন। তারাই নিজের সন্তানকে চুমু ও আদর করে যাদের অন্তরে আল্লাহ দয়া দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাদের উপরই রহম করেন যারা অন্যের উপর রহম করে থাকেন। যারা অন্যের উপর রহম করে না তারা নিজেও রহম থেকে বঞ্চিত হয়।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ اِنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَاْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - بخاری، مسلم

"হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে ডেকে আনার জন্য সংবাদ বাহক পাঠালেন এবং বলে পাঠালেন যে, "আমার বাচ্চার শেষ সময় সমুপস্থিত, আপনি একটু দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য তাশরীফ আনুন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ বাহককে বলে পাঠালেন, "গিয়ে আমার সালাম বলবে এবং বলবে তিনি বলেছেন, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন তা আল্লাহর এবং যা দিয়েছেন তাও আল্লাহরই এবং প্রত্যেক জিনিসকেই এখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে হবে। অতএব, তুমি ধৈর্য ধর এবং তার নিকট প্রতিদান ও সওয়াবের আশা রাখো।"–বুখারী ও মুসলিম

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা পুনরায় ডাকালেন এবং কসম দিলেন, "আপনি অবশ্যই তাশরীফ আনুন।" সুতরাং তিনি কন্যার নিকট যাওয়ার জন্য উঠলেন। তাঁর সাথে হযরত সায়াদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মায়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, উবাই বিন কায়াব

রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আরো কিছু লোক ছিলেন। তিনি হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে পৌঁছলে শিশুটিকে তাঁর কোলে দেয়া হলো। সে সময় শিশুটির রূহ কবজ করা হচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এটা কি ? আপনিও কাঁদছেন ! তিনি বললেন, এটা রহম। যা আল্লাহ বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন যারা পরস্পরের প্রতি রহম করে থাকেন।"

### সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করা নির্দয়তার নামান্তর

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ـ بخارى، مسلم

"হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জনৈক গ্রামবাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, তোমরা কি শিশুদেরকে চুমু দাও, আদর করো। আমরা তো শিশুদেরকে চুমু দিই না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, আমার কি ক্ষমতা ! আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহম ঝেঁটিয়ে বিদায় করে থাকেন।"–বুখারী ও মুসলিম

শিশুদেরকে চুমু না দেয়া এবং আদর না করা কোনো ভালো কথা নয়। বরং তা নির্দয়তার নিদর্শন। শিশুদেরকে আদর না করার অর্থ হলো আল্লাহ অন্তর থেকে রহমতের উৎস বের করে দিয়েছেন। রহমতের উৎস যদি থেকেই থাকে তাহলে মানুষ নিজের সন্তানকে অবশ্যই আদর করবে।

### শিশুকে কোলে নেয়া

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ صَلَوٰتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلٰى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ ـ

"হযরত আদি ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, "আমি নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঘরে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সওয়ার অবস্থায় দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো।"

একবার হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘাড়ে সওয়ার ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তা দেখে বললেন, বাঃ ! খুব সুন্দর সওয়ারী পেয়েছে তো ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শুনে বললেন, "সওয়ারও খুব ভালো সওয়ার।"–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোলে নিয়ে এক উরুর উপর আমাকে ও অন্য উরুর উপর হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুক বসাতেন এবং আমাদের দুজনকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলতেন, হে আল্লাহ ! এ দুজনের উপর রহম করো। আমি তাদের উপর দয়া দেখিয়ে থাকি।–বুখারী

হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এরা আমার গলার মনি। তিনি কন্যা গৃহে গমন করে বলতেন, আমার বাচ্চাদেরকে আনো। তাদের আনা হলে তিনি তাদেরকে কোলে নিতেন, চুমু দিতেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরতেন।
–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি প্রায় কোলে নিতেন এবং তার মুখের উপর মুখ রেখে আদর করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমি একে ভালোবাসি এবং তাকেও ভালোবাসি যে একে ভালোবাসে।
–সিরাতুন্নবী দ্বিতীয় খণ্ড

**সন্তানের প্রতি রাসূলের ভালোবাসা**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি দিন-রাত তাঁর খিদমতে লেগে থাকতেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আত্মীয়-স্বজনকে যেভাবে ভালোবাসতেন তেমন আর কাউকে ভালোবাসতে দেখেননি।–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

০ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থায়ী নিয়ম ছিলো, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখন সর্বশেষ নিজের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে যেতেন এবং সফর থেকে ফিরে সর্বপ্রথম মসজি

দে দু রাকাত নামায আদায় করে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে পৌছতেন।

০ একবার কোনো কথায় হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেল। এ ঘটনা জানতে পেরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গৃহে গেলেন এবং উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দিলেন। অতপর তিনি যখন বাইরে এলেন তখন খুব হাসি-খুশি ছিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যখন গৃহাভ্যন্তরে গমন করেছিলেন তখন খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর যখন বাইরে আসছিলেন তখন খুব খুশী অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হাঁ আমি ঐ দু ব্যক্তিকে মিলিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি।"

–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

০ একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা জানতে পেরে খুব দুঃখিত হলেন। তৎক্ষণাৎ মসজিদে গিয়ে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি নিজের নাখোশের কথা উল্লেখ করে বললেন, ফাতেমা আমার প্রিয় কন্যা এবং কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দেবে।–বুখারী

০ হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আবুল আছ বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে এলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, এসব কয়েদীকে ফিদিয়া নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে। আবুল আছের নিকট ফিদিয়া আদায় করার মতো অর্থ ছিল না। মুক্তির জন্য স্বগৃহে ফিদিয়ার অর্থ প্রেরণের খবর পাঠালেন। পতিভক্তা স্ত্রী নিজের মা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রদত্ত হার তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আছ এ হার ফিদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। হার যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এলো তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সাহাবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "তোমরা সম্মত হলে এ হার কি যয়নবকে ফিরিয়ে দেয়া যায় ?" সাহাবীরা বললেন, অবশ্যই ফিরিয়ে দিন। অতপর তিনি সে হার হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফিরিয়ে দিলেন।

০ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে ছোট পুত্র হযরত ইবরাহীম মদীনার মফস্বল এলাকার এক কামার আবু ইউসুফের

নিকট লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তিনি প্রায়ই পায়ে হেঁটে সেখানে যেতেন। আবু ইউসুফ ছিলেন কামার। এজন্য ঘর ধোয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। তিনি সে ধোয়ার মধ্যেই বসতেন। শিশুকে কোলে নিতেন এবং আদর করতেন। অতপর মদীনা ফিরে আসতেন।–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

০ একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তার উপর খেলা করছিলেন। তিনি দু বাহু আন্তরিক স্নেহে প্রসারিত করে দিলেন। যাতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট চলে আসেন। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসতে হাসতে তাঁর নিকট আসতেন এবং দুষ্টমী করে আবার সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং এক হাত তার থুতনীর উপর ও অপর হাত মাথার উপর রেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর বললেন, হুসাইন আমার, আর আমি হুসাইনের।–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, বুখারী উদ্ধৃতিসহ

০ হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি প্রিয় শিশু কন্যা ছিল। তার নাম ছিল উমামাহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমামাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায় নামাযের সময়ই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতো। তিনি নামাযে দাঁড়ালে সে কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে যেত। রুকূ'র সময় তিনি তাকে নামিয়ে দিতেন। তিনি পুনরায় খাড়া হলে সে আবার সওয়ার হতো।

০ একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে তোহফা হিসেবে কিছু জিনিস পাঠালেন। তার মধ্যে সোনার হারও ছিল। সে সময় সে সেখানে খেলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হার আমি তাকে দিবো, ঘরে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। গৃহের মহিলারা মনে করলেন যে, তিনি এ হার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেই দেবেন। কিন্তু তিনি উমামাহকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তার গলায় সে হার পরিয়ে দিলেন।–সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড

## মায়ের মমতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিলো এবং শিশু সন্তান নিজের নিকট রাখতে চাইল। মায়ের অবস্থা ছিল অকল্পনীয়। একদিকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, অপরদিকে শিশু সন্তান

ছিনিয়ে নেয়ার কষ্ট। এ করুণ অবস্থায় মহিলাটি রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলো এবং নিজের ঘটনা অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তার নিকট থেকে পৃথক করে দিয়েছে এবং এখন সে আমার নিকট থেকে এ আদরের পুত্তলিকে ছিনিয়ে নিতে চায়। হে আল্লাহর রাসূল ! সে আমার কলিজার টুকরা। আমার পেট তার আরামস্থল। আমার বুকের ছাতি তার মশক সদৃশ এবং আমার কোল তার ঘরের মতো। হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এ দুঃখ কি করে বরদাশত করবো।"

মহিলাটির এ ফরিয়াদ শুনে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দ্বিতীয় বিয়ে না করবে, ততক্ষণ তোমার নিকট থেকে তোমার সন্তানকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।"–আবু দাউদ ঃ কিতাবুত তালাক

## হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকাঙ্ক্ষা

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঘটনা শোনালেন। তিনি বললেন, একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ! আপনার দৃষ্টিশক্তি কি কারণে ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং আপনার কোমর কেন বেঁকে যাচ্ছে ? হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন, দৃষ্টিশক্তি তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের চিন্তায় চিন্তায় ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর কোমর তার ভাই বিন ইয়ামিনের চিন্তায় বেঁকে গেছে। ঠিক তক্ষুণি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট এলেন এবং বললেন, "আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন ?" হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, "না, বরং আল্লাহর দরবারে নিজের দুঃখ কষ্টের ফরিয়াদ পেশ করছি।" হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, "আপনি আপনার যে দুঃখ বর্ণনা করলেন, তা আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন।" অতপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম চলে গেলেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার ! তোমার কি এক বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রহম হয় না ? তুমি আমার চক্ষুও ছিনিয়ে নিয়েছ এবং আমার কোমরও বাঁকিয়ে

দিয়েছ। পরওয়ারদিগার ! আমার দুটি ফুলকে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও। যাতে করে আমি উভয়কে শুধু শুঁকতে পারি। অতপর তুমি যা ইচ্ছে তাই আমার সাথে করো। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পুনরায় তাশরিফ আনলেন এবং বললেন, হে ইয়াকুব ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন, ইয়াকুব খুশী হয়ে যাও। যদি তোমার দু পুত্র মরে যেত তাহলেও তোমার খাতিরে আমি তাদেরকে জীবিত উঠিয়ে দিতাম। যাতে তুমি উভয়কে দেখে নিজের চক্ষু শীতল করতে পার।

–তারগিব ও তারহিব ঃ তৃতীয় খণ্ড

### রাসূলের দরবারে এক মা'র ফরিয়াদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে একজন মহিলা এসে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার একটি পুত্র আছে। অনেক কাজেই সে আমাকে সাহায্য করে। মহিলা হবার কারণে আমি বাইরে কাজ করতে পারি না। সে কূপ থেকে আমার জন্য পানি এনে দেয় এবং বাইরের অন্যান্য কাজও করে দেয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার থেকে বিচ্ছিন্ন আমার স্বামী এ শিশুকেও আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির ফরিয়াদ শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন, "ঠিক আছে, লটারী করো। লটারীতে যার নাম আসবে সে শিশু পুত্রকে সাথে নিয়ে যাবে। পুত্রের পিতা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল ! সে আমার পুত্র। অন্য কেউ তাকে সাথে নিয়ে যাবার দাবী কি করে করতে পারে ? আর আমি থাকতে অন্য কেউ তাকে কি করে নিয়ে যেতে পারে ?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা-পিতা উভয়ের কথা শুনে পুত্রের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বেটা! ইনি তোমার পিতা এবং ইনি তোমার মাতা। যাকে চাও তার হাত ধরে চলে যাও। এ স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। পুত্র নিজের স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালো। অতপর নিজের মা'র কাছে গেল এবং তার হাত ধরলো।

# সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

**দৈহিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণও সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু এ অধিকার পূরণ সত্ত্বেও আপনি যদি তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিষ্টাচার ও সভ্যতা থেকে গাফেল থাকেন তাহলে আপনি বড়ো ধরনের অন্যায় করছেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া আপনার সন্তান সন্তান হতে পারে না। যে সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে সন্তান কামনা করেন এবং যেসব উত্তম আশা পূরণের লক্ষ্যে দিন-রাত তাদের লালন-পালনে সময় ব্যয় করেন তা তখনই পূরণ হতে পারে যখন আপনি সন্তানের দীনি শিক্ষা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের হক আদায় করবেন।**

সন্তানকে নেক ও ভাগ্যবান করে গড়ে তোলা একদিকে যেমন আপনার দীনি দায়িত্ব। তেমনি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের অধিকারভুক্ত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, আপনি অত্যন্ত হিকমত, চিন্তা-ভাবনা, ধৈর্য, কর্তব্য সচেতনতা, উদারতা, রুচিশীলতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। সন্তানের এ অধিকার পূরণ করেই আপনি আশা করতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার জন্য শান্তির কারণ, সমাজের জন্য রহমাতের মাধ্যম, মিল্লাতের জন্য গৌরবের আধার এবং দীনের সম্পদ হতে পারে। সন্তান লালন-পালনে প্রভূত পরিমাণ জীবনী শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ের পরও যদি আপনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেন তাহলে আপনি সাংঘাতিক ধরনের সামাজিক অপরাধ করছেন। এ অপরাধের পরিণামফল অত্যন্ত বিষময়।

## শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মায়ের বিশেষ অংশ

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিসন্দেহে দায়িত্ব শুধু আপনার একার নয়। মাতা-পিতা উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। মায়ের প্রশিক্ষণের মতো পিতার শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজন। বরং এ ব্যাপারে ব্যয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে, ইসলাম তা পুরোপুরি পিতার উপরই বর্তিয়েছে। মা-কে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সন্তান লালন-পালনে মায়ের তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এতে তারই সিংহ ভাগ প্রচেষ্টা থাকে। সন্তানের শারীরিক যত্ন এবং লালন-পালনে মায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি তার শিক্ষা-দীক্ষাতেও তার বিশেষ অংশ রয়েছে এবং মায়ের প্রশিক্ষণেই শিশু সন্তান সে ধরনের যোগ্য হয়ে উঠে

যাতে দেশ ও জাতির সম্মান বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে মাতা-পিতারও সুখ সৌভাগ্য ঘটে।

পিতা আয়-উপার্জনের লক্ষ্যে এবং জীবনের প্রয়োজন পূরণার্থে বেশীর ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য তিনি অধিকাংশ সময় সন্তানদের সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় কাটান। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যথাযথ মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান না। প্রকৃতিগতভাবেই মা এ ব্যাপারে বেশী বেশী সুযোগ লাভ করে থাকেন। সাধারণত তিনি সবসময় সন্তানদের সাথে থাকেন। সন্তানদের পুরো জীবন এবং তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিকই তার সামনে থাকে। সবসময় সাথে থাকার কারণে শিশুরা মায়ের ভীতিতে ভোগে না। অসাধারণ নরম মেজাজ, ধৈর্য এবং নজিরবিহীন আপত্য স্নেহের কারণে শিশুরা মায়ের প্রতি ভীতিহীন ও অনুগত হয়ে থাকে। নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে মায়ের নিকট সব ধরনের দাবী-দাওয়া, প্রতিবাদ এবং দুষ্টমি করে। এভাবে তাদের সকল যোগ্যতা ও ভালো-মন্দ শক্তি প্রকাশিত হয়। এতে তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ সহজেই করা সম্ভব। তবুও প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য যে ধৈর্য, ত্যাগ, উদারতা, স্নেহ-ভালোবাসা এবং নৈতিক গুণাবলী প্রয়োজন তা আল্লাহ্ পাক পিতার তুলনায় মাতাকেই বেশী দান করেছেন। পিতা খুব তাড়াতাড়ি অধৈর্য ও ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু মাতা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য, দয়া, স্নেহ ও সুন্দর আচরণ করে থাকেন এবং শিশুদের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যাপারে বেশী সফল হয়ে থাকেন। সন্তানের ভুল-ভ্রান্তিতে ক্রোধান্বিত হয়ে পিতা অসন্তুষ্ট ও সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে বসে। পক্ষান্তরে মা সন্তানকে বুকে লাগিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সংশোধন এবং মর্যাদাপূর্ণ করে তোলার জন্য অন্তর দিয়ে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

### মহান মায়ের প্রশিক্ষণে ভাগ্য পরিবর্তন

সওদাগরদের একটি কাফেলা বাগদাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের সাথে একজন নব যুবকও ছিল। কতিপয় হিদায়াতসহ তার মা সে কাফেলার সাথে পাঠিয়ে ছিলেন। যাতে সে সহিহ-সালামতে গন্তব্যে পৌছতে পারে এবং দীনের শিক্ষা অর্জন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নির্দেশাবলী শুনাতে এবং আলো প্রদর্শন করতে পারে।

কাফেলা খুব স্বচ্ছন্দেই অগ্রসর হচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি ডাকাত দল কাফেলার উপর হামলা করে বসলো। কাফেলায় যোগদানকারীরা নিজে

দের মাল-সামান রক্ষার জন্য অনেক চাল-চাললো। কিন্তু তাদের চালে ডাকাতদের কিছু হলো না। তাদের নানা ধরনের দয়ার আবেদনও ডাকাতরা কর্ণপাত করলো না। কাফেলার প্রত্যেকের নিকট থেকে তারা সবকিছু ছিনিয়ে নিল। ডাকাতদের কাজ সারা হলে তাদের মধ্যে একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে নব যুবককে জিজ্ঞেস করলো ঃ

ডাকাত ঃ মিয়া, তোমার কাছে কি কিছু আছে ?

যুবক ঃ জ্বী হাঁ। আমার কাছে ৪০টি দিনার আছে।

ডাকাত ঃ তোমার নিকট ৪০টি দিনার আছে। (ডাকাতের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ খাস্তা হাল গরীবের নিকট ৪০টি দিনার কোত্থেকে এলো। আর যদি থাকেও তাহলে সে আমাদের কাছে বলছে
কেন–ডাকাতটি অনেকক্ষণ চিন্তা করলো এবং এ আশ্চর্য ধরনের যুবককে সরদারের নিকট নিয়ে গেল।)

ডাকাত ঃ সরদার ! এ ছেলেটিকে দেখুন। সে বলে, তার নিকট ৪০টি আশরাফি আছে।

সরদার ঃ মিয়া সাহেব জাদা ! তোমার কাছে কি সত্যি দিনার আছে ?

যুবক ঃ জ্বী হাঁ। আমার কাছে ৪০টি দিনার আছে।

সরদার ঃ ভালো, তোমার দিনার কোথায় রেখেছ ? সরদার গরীব ছেলেটির প্রতি আশ্চর্য নজরে দেখতে লাগলো।

যুবক ঃ জ্বী, আমার কোমরের সাথে একটি থলি বাঁধা আছে। দিনারগুলো তাতেই রয়েছে।

সরদার ঃ যুবকটির কোমর থেকে থলি খুলে গুণে দেখলো তাতে ৪০টি দিনারই রয়েছে। সরদার হতভম্ভ হয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত যুবকটিকে দেখতে লাগলো। অতপর বললো, সাহেব জাদা ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

যুবক ঃ আমি দীনের ইলম হাসিলের জন্য বাগদাদ যাচ্ছি।

সরদার ঃ সেখানে কি তোমার পরিচিত কেউ আছে ?

যুবক ঃ জ্বী না। সেটা একটি অপরিচিত শহর। আমার আম্মা আমাকে ৪০টি দিনার দিয়েছিলেন। যাতে আমি নিশ্চিন্তে দীনের ইলম হাসিল করতে পারি। সে অপরিচিত শহরে আমার প্রয়োজনের প্রতি কে নজর রাখবে—আর আমিইবা কেন অপরের মুখাপেক্ষী থাকবো।

সরদার অত্যন্ত আগ্রহ ও বিস্ময়ের সাথে যুবকটির কথা শুনছিলো। তার পেরেশানী বাড়ছিলো। এবং চিন্তা করছিলো যে, যুবকটি দিনারগুলো কেন লুকায়নি। যদি সে না বলতো, তাহলে আমার কোনো সাথীর ধারণাও হতো না যে, এ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও গরীব যুবকের নিকট আবার কিছু থাকতে পারে। যুবকটি কেন ভাবলো না যে, সে এক অপরিচিত স্থানে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যত এবং শিক্ষার ব্যাপারটি এ অর্থের উপরই নির্ভরশীল। শেষ পর্যন্ত সে এ অর্থ লুকালো না কেন। যুবকটির সরলতা ও সত্যবাদিতা তার অন্তরে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো, সাহেব জাদা! তুমি এ অর্থ লুকাওনি কেন ? যদি তুমি না বলতে এবং অস্বীকার করতে তাহলে আমরা সন্দেহও করতাম না যে, তোমার নিকট আবার কোনো অর্থ থাকতে পারে।

যুবক ঃ আমি যখন বাড়ী থেকে বের হচ্ছিলাম তখন আমার আম্মা নসিহত করলেন যে, বেটা ! যাই হোক, কখনো মিথ্যা বলবে না। আমি আমার আম্মার নির্দেশ কি করে লংঘন করতে পারি।

সরদারের আভ্যন্তরীণ মানসটি জেগে উঠলো। সে চিন্তা করতে লাগলো, এ যুবক নিজের ভবিষ্যতের অনিবার্য ধ্বংস দেখেও মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত নয়–আর আমি দীর্ঘ দিন যাবত আমার পরওয়ারদিগারের নির্দেশাবলীকে পদদলিত করছি। সে যুবকটির সাথে কোলাকুলি করলো। তার দিনার তাকে ফিরিয়ে দিল। কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদের আসবাবপত্র প্রত্যর্পণ করলো এবং আল্লাহর সমীপে সিজদাবনত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। সত্যিকারভাবে সে তাওবা করলো এবং আল্লাহর রহমাত তাকে ঘিরে নিলো। এ ডাকাত সমকালীন যুগে আল্লাহর একজন মহান ওলি হয়েছিলেন এবং আল্লাহর বান্দাদের লুণ্ঠনকারী আল্লাহর বান্দাদের দীনের দৌলতে বন্টনকারী হয়ে গিয়েছিলেন। মহান মাতার শিক্ষা শুধু যুবককেই উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করেনি বরং ডাকাতদের তাকদীরও বদলে দিয়েছিল। এ সেই সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক যিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাই নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং যাঁর নামের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্রদ্ধায় অন্তর অবনত হয়ে পড়ে।

# সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কেনা চায়। এটা একটা স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ এ আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতা এ ব্যাপারে বিশেষ করে একটু বেশী চিন্তাশীল, অনুভূতি প্রবণ এবং তৎপর হয়ে থাকেন। দুনিয়ার নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাতা-পিতা কখনো এ চিন্তা মুক্ত হন না, বরং তাদের বেশীর ভাগ চিন্তা ও প্রচেষ্টা এ লক্ষ্যে পরিচালিত হয় যে, তাদের সন্তানের ভবিষ্যত যেন শানদার হয়। আর সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন এমন মাতা-পিতা সম্ভবত খুব কমই আছেন।

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা খুবই পসন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে, সমাজের দৃষ্টিতে এবং দীনের দৃষ্টিতে এটা খুবই উন্নত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে পরিগণিত। বরং ইসলাম তো এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধই করে থাকে। মুমিন মাতা-পিতাকে তাকিদই দিয়ে থাকে যে, সে যেন নিজের সন্তানের ভবিষ্যতকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে গড়ে তোলে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলতে কি বুঝায় ?

## ইসলামের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কি ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রশ্নটি হলো মুসলমান মাতা-পিতা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা কেন করে থাকেন ? অন্যান্য মাতা-পিতার সাথে তাদের আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য কোথায়? এ তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদেরকে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত বুঝতে হবে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَلِىَ مِنْ وَّرَائِى وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ق وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ مريم : ٤-٦

"[হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম] বললেন, হে আমার রব ! আমার অস্থি মজ্জা পর্যন্ত গলে গেছে। আর মাথা বার্ধক্য চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট দোয়া করে কখনও

ব্যর্থকাম হইনি। আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার উত্তরাধিকারীও হবে। আর ইয়াকুব বংশের মীরাসও লাভ করবে। আর হে রব ! তাকে একজন পসন্দ সই মানুষ বানাও।"–সূরা মরিয়ম ঃ ৪-৬

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং তার স্ত্রী আল ইয়াশবা উভয়েই বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলো এবং তাদের কর্মশক্তি জবাব দিয়েছিল। এ অবস্থায় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এ ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, তার পরে তার মিশনের ঝাণ্ডাবাহী কে হবে ? এবং আল্লাহর দীনের হেফাজত ও প্রচারের দায়িত্ব কে আনজাম দেবে। তিনি দেখছিলেন যে, নবী বংশের যুবকেরা ধর্মদ্রোহী ও দায়িত্বহীন। একজনও এমন নেই যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার হতে পারে। তিনি এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অবনত মস্তকে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন।

"পরওয়ারদিগার ! আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। যে আমার ও আলে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মিরাছের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। হে আমার রব ! তাকে তোমার পসন্দনীয় বান্দা বানিও।" হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজের বংশ ধারা বাকী রাখার জন্য সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করেননি। তার ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্যও সন্তান কামনা করেননি। বরং তারপর দীনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার যথার্থ উত্তরাধিকার ও আল্লাহর পসন্দনীয় বান্দা হবার জন্য সন্তান কামনা করেছিলেন।

মু'মিন পিতার অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত এ দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে এমন এক নেক্‌কার পুত্র দান করেছিলেন যার শানদার ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবেই সাক্ষী রয়েছে ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۙ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَّبَرًّا ۢبِوَالِدَيْهِ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ مريم : ١٢-١٤

"আমরা তাকে বাল্যকাল থেকেই 'হুকুম' দ্বারা ধন্য করেছি এবং নিজের নিকট থেকে তাকে নম্র মন ও পবিত্রতা দান করেছি আর সে

বড়ো পরহেজগার এবং তার মাতা-পিতার অধিকার রক্ষাকারী ছিল। সে না ছিল অহংকারী-অত্যাচারী, আর না নাফরমান।"

সফল ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে পবিত্র কুরআনে এখানে হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের চরিত্রের কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

হুকুম, নরম অন্তর, পবিত্রতা, মুত্তাকিয়ানাহ জীবন, মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণকারী এবং বিদ্রোহ ও নাফরমানী থেকে পবিত্র জীবন।

হুকুমের অর্থ হলো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি। দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার যোগ্যতা খুবই পসন্দনীয় এবং ভালো গুণ।

নরম অন্তর শুধু একটি গুণই নয়। বরং অনেক নৈতিক গুণের ভিত্তি।

পবিত্রতা অর্থাৎ গুনাহ, শরমহীনতা, বিপথগামী এবং যুলুম-নির্যাতন থেকে তাঁর নফস পবিত্র ছিল। নফসের পবিত্রতা উঁচু ধরনের নৈতিক মর্যাদা।

তাকওয়া, আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারীর জীবনই সফল জীবন। আর একজন মুত্তাকী মানুষই আল্লাহর দৃষ্টিতে ইজ্জত ও মর্যাদার দাবীদার হতে পারে।

মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণ সে সম্পদ যা সমাজ জীবনে সফল অধিকার আদায়ের জন্য মানুষকে প্রস্তুত রাখে। মাতা-পিতার চক্ষুর আলো এবং অন্তরের শান্তি সে সন্তানই দিতে পারে যে অনুগত, খিদমতগুজার এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণকারী। তারা বিদ্রোহীও নয় এবং নাফরমানও নয়।

পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনাকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করে দেখুন আপনি কি চান। আপনার আকাঙ্ক্ষা কি। আপনি আপনার রবের নিকট কি আশা এবং দোয়া করে থাকেন। আপনার দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নকশা কি। সে নকশার সাথে কুরআনের এ নকশার কতটুকু মিল রয়েছে। আর এজন্য আপনার চেষ্টাইবা কি ?

উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ শুধু এ নয় যে, আপনার সন্তান সচ্ছল হবে। তারা উঁচু ডিগ্রীধারী এবং বড়ো বড়ো পদ লাভ করবে। আরাম-আয়েশের সকল বস্তু তাদের নিকট থাকবে। দুনিয়ার মান-মর্যাদা এবং ক্ষমতা ও

প্রতিপত্তি হবে। প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং উন্নত ধরনের গাড়ী থাকবে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য এসব আকাঙ্ক্ষা করবেন, অথবা তা হাসিলের জন্য সাহায্য করবেন, ইসলাম তাতে বাধা দেয় না। অবশ্য ইসলাম আপনার মস্তিষ্কের এ প্রশিক্ষণ দিতে চায় যে, আপনার দৃষ্টি যেন শুধু এসব বস্তুতেই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং আপনি যেন এসব বস্তুকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ মনে করতে না থাকেন।

আপনার এ আশা অপসন্দনীয় নয় যে, আপনার সন্তান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, উঁচু পদ লাভ করুক, আরাম-আয়েশের সম্মান লাভ করুক এবং বস্তুগত দিক থেকে সফল হোক। এ সবের জন্যও আপনার চেষ্টা অপসন্দনীয় নয়। অপসন্দনীয় হলো, এ দুনিয়া বা বস্তুগত সাফল্যকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া এবং সন্তানের দীন ও আখলাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। মুসলমান মা কোনো সময়ই এ সত্যকে যেন মস্তিষ্ক থেকে বের করে না দেন যে, প্রকৃত জীবন হলো আখেরাতের জীবন এবং ঈমান থেকে গাফেল থেকে সে জীবন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আপনার সন্তানের শানদার ভবিষ্যত হলো সে দীনি শিক্ষায় সজ্জিত হোক। দীনের ব্যাপারে তারা গভীরতা লাভ করুক। তারা পবিত্র চরিত্র এবং ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধি হোক। সামাজিক দায়িত্ব পালনে তারা অগ্রগণ্য হোক। তাদের জীবন পবিত্র, আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারীর নমুনা হোক। মাতা-পিতার অনুগত ও খিদমত গুজার হোক। বস্তুগত জীবনের উঁচু উঁচু পদে সমাসীন থেকেও দীনে হকের সত্য প্রতিনিধি এবং অকপট খাদেম হোক।

## দীনে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্থান

সন্তানের জীবনকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সফল বানানোর জন্য প্রয়োজন হলো আপনাকে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অসাধারণ মনোযোগ দিতে হবে। চরম হিকমত, একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের দৃষ্টিতে যেমন সমাজের দৃষ্টিতেও তেমনি মর্যাদাকর। এর বদৌলতে আপনি দুনিয়াতেও মান-মর্যাদা ও সুনাম পাবেন এবং আখেরাতেও মান-মর্যাদার অধিকারী হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো আপনি তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا نَحِلَ وَالِدُ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ـ

"পিতা নিজের সন্তানকে যাকিছু প্রদান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।"

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ، اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ ـ

"যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার আমলের প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিন বিষয়ের সওয়াব ও পুরস্কার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। প্রথম, সে কোনো সাদকায়ে জারিয়া করে গিয়ে থাকলে ; দুই, এমন কোনো জ্ঞান যা থেকে জনগণ উপকৃত হতে থাকে ; তিন, নেক পুত্র যে তার জন্য দোয়া করে।"

একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কুরআনের আলেমের মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِهٖ اُلْبِسَ وَالِدَهٗ تَاجًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ ابو داود، حاكم

"যে কুরআনের জ্ঞান হাসিল করলো এবং তার উপর আমলও করলো তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। যার আলো সে সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী উত্তম হবে যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি তা বলো।"–আবু দাউদ, হাকেম

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাওয়ায়েতে টুপির পরিবর্তে জান্নাতের পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো, শিখলো এবং তার উপর আমল করলো কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে।

সূর্যের আলোর মতো তার আলো হবে এবং তার মাতা-পিতাকে এমন মূল্যবান দুটি পোশাক পরানো হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়াও হতে পারবে না। তখন মাতা-পিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরিধান করানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পুত্রের কুরআন হাসিলের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হচ্ছে।"

এসব বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তান প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মাতকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, উম্মাতের কোনো গৃহই যাতে সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এও আলোকপাত করেছেন যে, যে সকল মাতা-পিতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

## সন্তানের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিদান

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ ـ ترغيب وترهيب بحو اله ابن ماجه

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তানদের সাথে রহম করমপূর্ণ ব্যবহার করো এবং তাদেরকে ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।"-তারগীব ও তারহীব

এ হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের তাকিদ দেয়ার সাথে সাথে এ তাকিদও দিয়েছেন যে, তাদের সাথে রহম-করমপূর্ণ ব্যবহার করো। বরং প্রথম এ তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, সন্তানদের সাথে মান-মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করো। অতপর তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।

মাতা-পিতার জন্য ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সাথে রহম-করমপূর্ণ ব্যবহার এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সেদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতপর উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। সন্তানদের সাথে রহম-করমের ব্যবহার করার অর্থ হলো তাদের মান-মর্যাদার প্রতি চরমভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ বা কথা বলা যাবে না যাতে

তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং তারা নিজেদেরকে নীচু ভাবতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়ই এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং শিশুর মর্যাদা ও অহংবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকালেই উত্তম সময় যখন আপনি শিশুর মস্তিষ্ক ও অন্তরের পরিষ্কার আমলে আপনি যে ধরনের ইচ্ছা সে ধরনের ছবি এঁকে দিতে পারেন। এ ছবি বা চিত্র আজীবন চরিত্র ও কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।

আপনিই চিন্তা করুন যে, মাতা-পিতা অথবা শিক্ষকের ভুল কর্মপদ্ধতির ফলে শিশুর মস্তিষ্কে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সে দুর্বল, অকেজো এবং নীচ। সে এমন যোগ্য নয় যে, তার সাথে ভালোভাবে কথা বলা যায়। সে এমন নয় যে, তার সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা যায়। সে এমন নয় যে, তার উপর আস্থা এনে কোনো কাজ ন্যস্ত করা যায়—তাহলে আপনিই বলুন, তার মধ্যে উচ্চ আশা, অহংবোধ সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণ কি করে সৃষ্টি হতে পারে। আর এ ধরনের শিশু দীন ও মিল্লাতের জন্য কিভাবে বড়ো কাজ আনজাম দিতে পারবে।

মাতা-পিতাকে নিজের কথা-বার্তা এবং কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যাদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের শিক্ষার ভার দেয়া হবে তাদের ব্যাপারেও ইতমিনান থাকতে হবে। শিশুর অহমবোধ এবং মর্যাদাবোধ এক মৌলিক শক্তি। এ শক্তি যদি আহত হয় তাহলে শিশুর মধ্যে সাহসহীনতা, ভীরুতা, নীচতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার নৈতিক দোষ সৃষ্টি হয়—আর এ ধরনের শিশুদের থেকে ভবিষ্যতে কোনো বড়ো কাজ আশা করা যায় না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ফরমানের আলোকে নিজের গৃহকে পরীক্ষা বা পর্যালোচনা করে দেখুন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও পর্যালোচনা করুন। উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য মৌলিক কথা হলো, মাতা-পিতা ও শিক্ষকদেরকে শিশুদের সাথে রহম-করমপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং কোনো এমন কথা বলতে পারবেন না যাতে শিশুর মর্যাদা বিনষ্ট এবং আহমবোধ আহত হয়।

**সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে জবাবদিহি**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এ ব্যাপারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন যে, আপনি সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা—পরিবারের সদস্যদের দীনি ও নৈতিক শিক্ষা দান অন্যতম দীনি দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَسْتَرْعِيْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ اَوْ كَثُرَتْ اِلاَّ سَأَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَقَامَ فِيْهَا اَمرَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعالٰى اَمْ اَضَاعَهُ حَتّٰى يَسْأَلُهُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ خَاصَّةً ـ

"আল্লাহ যে বান্দাকেই বেশী অথবা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক বানান না কেন—কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে অধীনস্ত লোকদেরকে দীনের উপর চালিয়েছিল না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে তার গৃহের লোকদের ব্যাপারেও হিসেব নেবেন।"

# শিক্ষা-প্রশিক্ষণ শুরুর সময়

শিকাগোর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ফ্রান্সিস উইলিওার পার্কার একবার শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে একজন মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"আমি আমার শিশুর শিক্ষা কখন থেকে শুরু করবো ?"

উইলিওার পার্কার বললেন, "আপনার শিশু কবে জন্ম নেবে ?"

"জন্ম নেবে ?" মহিলাটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, "জনাব, তার বয়সতো পাঁচ বছর হয়ে গেছে।"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আর ওদিকে মূল্যবান পাঁচটি বছর শেষ হয়ে গেছে।"

এটা কোনো গল্প নয়। বরং বাস্তব ব্যাপার। শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার শিক্ষা-দীক্ষার চিন্তা করা উচিত। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সাধারণত এ প্রাথমিক বছরগুলোকে নিশ্চিন্তায় নষ্ট করা হয়। ভূমিষ্ঠ হতেই শিশুর কানে আযান এবং ইকামাত প্রদানের হিকমত এটাই যে, প্রথম থেকেই আল্লাহর আজমত এবং মহানত্ব তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করুক। আল্লামা কাউয়েম রাহমাতুল্লাহ আলাই স্বলিখিত পুস্তক "তোহফাতুল ওয়াদুদে" বলেছেন ঃ

"এর অর্থ হলো, মানুষের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর আজমত ও শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌছুক। বালেগ হবার পর যে শাহাদাত প্রদান করে ইসলামে প্রবেশ করবে, তার তালকিন জন্মের দিন থেকেই করা দরকার। যেমন মৃত্যুর সময় তাকে কালেমায়ে তাওহীদের তালকিন দেয়া হয়। আযান এবং ইকামাতের দ্বিতীয় উপকার হলো, শয়তান ঘাপটি মেরে বসে থেকে জন্ম হতেই মানুষকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করতে চায়। এ সময় আযান শুনতেই সে পালিয়ে যায় এবং শয়তানের দাওয়াতের পূর্বেই শিশুকে ইসলাম এবং আল্লাহর ইবাদাতের দাওযাত দেয়া হয়।

শিশু যদিও জীবনের প্রথম দিনগুলোতে কথা বলতে পারে না, তবুও অনুভব করতে পারে এবং শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সে মা'র চাল-চলন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে। এজন্য এ সময়েও শিশুর সামনে কোনো খারাপ কথা এবং অভদ্র আচরণ করা যাবে না।

ভালো ভালো শব্দ এবং ভালো ভালো বোল দিয়ে তাকে মানুষ করতে হবে। তার পাশে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

যখন শিশুর কথা ফুটতে থাকে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা এবং প্রথম থেকেই তাওহীদের শিক্ষা এবং আল্লাহর গুণাবলীর সঠিক ধারণা তার মগজে ঢোকাতে হবে। হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশে যখনই কোনো শিশু কথা বলতে শিখতো তখনই তিনি তাকে সূরায়ে আল ফুরকানের এ আয়াত শিক্ষা দিতেন ঃ

اَلَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○ـ الفرقان : ٢

"যিনি যমীন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্র বানিয়ে লন নাই, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউই শরীক নেই, যিনি সব জিনিসই সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার একটি তাকদীর নির্দিষ্ট করেছেন।"—সূরা আল ফুরকান ঃ ২

অন্য এক হাদীসে এসেছে, যখন শিশু কথা বলতে থাকে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা দান করো ঃ

اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ ابن سنى

"যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও।"

হাদীসের অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও। এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কালেমায়ে তাওহীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মর্মার্থ হলো, তাদেরকে সম্পূর্ণ কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শিক্ষা দান করো।

### কুরআন, দোয়া এবং নামায শিক্ষাদান

শিশুর যখন কিছু বুদ্ধি বাড়ে এবং হুশিয়ার হয়ে উঠে তখনই তাদেরকে নামাযের বিষয়সমূহ ইয়াদ করাতে হবে। নামাযের কিরআতের ব্যাপারে ছোট বেলা থেকেই শিক্ষাদান করা উচিত এবং কিরআত যাতে সহীহ এবং শুদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেয়া দরকার। কারণ ছোট বেলায় ভুল কিরাআত শিক্ষা পেলে সারা জীবনই কিরাআত ভুল থেকে যায়।

এ বয়সেই পবিত্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত বা হিফজ করাতে হবে এবং কিছু অংশের অর্থ ও মর্মার্থ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এতে প্রথম থেকেই কুরআন পাক সম্পর্কে তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, এ কিতাব ভালোভাবে বুঝে পড়তে হবে।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পঠিত সুন্নাত দোয়াসমূহও তাদেরকে ইয়াদ করাতে হবে। নিসন্দেহে পারিবারিক কাজ-কর্মে আপনি দিন-রাত ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আপনার এ দায়িত্ব অন্যান্যদের দায়িত্ব থেকে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানকে আপনি একটি সুন্দর বৃত্তি হিসেবে বানিয়ে নিন এবং অন্তর দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করুন। শিশুদের বয়স ও মেধার প্রতি দৃষ্টি রেখে কতিপয় দোয়া তাদেরকে অবশ্যই শেখাতে হবে। যেমন ঘুম যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠার দোয়া, খানা-পিনার দোয়া, নতুন কাপড় পরিধানের এবং নতুন ফল খাওয়ার দোয়া, হাঁচির দোয়া এবং তার জবাব ও নতুন চাঁদ দেখার দোয়া ইত্যাদি। এসব দোয়া মস্তিষ্ক তৈরি এবং দীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে থাকে। মিলযুক্ত শব্দ ও কবিতা শিশুরা খুব উৎসাহের সাথে পাঠ করে থাকে এবং তা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করুন এবং তাদের এ আগ্রহ পূরণার্থে সুন্দর ও যথোপযুক্ত কবিতাংশ নির্বাচন করে দিন। যেমন ঃ

حَسْبِىْ رَبِّىْ جَلَّ اللّٰهُ    مَافِىْ قَلْبِىْ غَيْرَ اللّٰهِ

نُوْرِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ    لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

শিশুদের এ উৎসাহ পূরণে আপনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে তারা অবাঞ্ছিত কবিতা মুখস্ত করে তা বারবার আবৃত্তি করতে থাকবে। আর আপনি জানেন যে, নৈতিকতা রক্ষার জন্য ভাষার সংরক্ষণ কতখানি প্রয়োজন।

## ইসলামী আদব শিক্ষা দান

আদব ও সভ্যতা এবং জীবনের শিষ্টাচার শিক্ষার বয়সও এটাই। শিশুদেরকে অবুঝ বলে পরওয়া না করা এক ধরনের বিরাট আহাম্মকি। শৈশবকালে আপনি যে শিষ্টাচার শিখিয়ে দেবেন এবং যে অভ্যাস গড়ে তুলবেন তা তার সারা জীবনেই প্রভাব ফেলবে। শৈশবকাল যেসব ভালো অথবা খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠে তা খুব কমই দূর হয়। এ বয়সে শিশুদের প্রতি বেশী বেশী দৃষ্টিদান খুবই প্রয়োজন। মা'র দায়িত্ব খুবই বেশী।

জীবনের প্রথম দিকে সামান্য অবহেলা চিরকালের জন্য লজ্জা ও পেরেশানীর কারণ হতে পারে।

একটি পরিকল্পনার অধীন হিকমত, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সাথে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। খানা-পিনা, উঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণের আদব শিক্ষা দিন। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-মাদ্রাসার আদবের কথা বলুন। পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার আদব, চলা-ফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে উঠা-বসার আদব, গৃহের এবং নিজের জিনিসসমূহকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিন এবং একটি সভ্য ও পবিত্র জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আপনি তার অভিভাবকত্ব করুন। একবার শুধু কোনো ভালো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হলো যে, আপনি সে ব্যাপারে অব্যাহতভাবে দৃষ্টি রাখুন এবং বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্ত হবেন না। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে শুধরে দিতে থাকুন এবং সামান্যতম ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবেন না। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদকার একটি খেজুর উঠিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আরে থু মেরে তা ফেলে দাও। তুমি কি জানো না যে, আমাদের জন্য সাদকা খাওয়া ঠিক নয়।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু সালমা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লালন-পালন করছিলেন। তিনি নিজের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ

كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ ! سَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِىْ بَعْدُ ـ متفق عليه

"আমি তখন ছোট ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে থাকতাম। খাবার সময় আমার হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, পুত্র ! বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। ব্যাস, এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।"

**পবিত্র কিসসা-কাহিনী শুনানোর ব্যবস্থা করা**

শৈশবকালে শিশুরা কিসসা-কাহিনী শুনতে খুবই আগ্রহী হয়। তারা অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে কিসসা-কাহিনী শুনেও থাকে এবং প্রভাবিতও হয়। বরং কিসসার কতিপয় চরিত্র তো তাদেরকে প্রভাবিত করে যে, তারা স্বয়ং তা হবার চেষ্টায় লেগে যায়। শিশুদের এ মনস্তাত্ত্বিক গুণের ফায়দা নিন এবং আপনি তাদেরকে যেভাবে তৈরির আকাঙ্ক্ষা করেন, সে ধরনের কিসসা-কাহিনীই শুনান। শুধুমাত্র তাদের আগ্রহ পূরণের জন্য কিসসা শুনাবেন না। বরং কিসসাকে শিক্ষার উত্তম মাধ্যম মনে করে তার ব্যবস্থা করুন। নবীদের পবিত্র কাহিনী শুনান। সাহাবায়ে কিরামের উদ্যমপূর্ণ ঘটনাবলী শুনান। ইসলামের মুজাহিদদের বীরত্ব গাঁথা শুনান। যুদ্ধের ময়দানের কৃতিত্বের উল্লেখ করুন। এমনিভাবে ইসলামের জন্য তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন।

জ্বীন-পরীর কাহিনী, ভূত-প্রেতের ঘটনা, যাদু-টোটকার কিসসা, দেও-দৈত্যের কাহিনী শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। তাদের খারাপ প্রভাবে শিশুদের মন-মগজ খারাপভাবে এক অজানা ভীতি তাদের অন্তর ও মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকে। উচ্চতম শিক্ষা লাভ সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের সংশয়ে তারা ভোগে।

কিসসা-কাহিনী শোনার আগ্রহ শিশুদের সহজাত আগ্রহ। তাতে বাধা দানও ঠিক নয় আবার এ ব্যাপারে তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়াও ভুল। অত্যন্ত কৌশল বা হিকমতের সাথে তাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করুন এবং এ প্রয়োজন ও আগ্রহ এমনভাবে পূরণ করুন যাতে আপনি তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণদানে সফল হন।

**নামাযের তাকিদ**

নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যা দীনের সাথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত রাখে। নামায দীনকে হেফাজতও করে। আবার দীনের প্রতি আকর্ষণও করে থাকে। দীনদার জীবন অতিবাহিত করার জন্য মানুষকে প্রস্তুতও করে। শুরু থেকেই শিশুদেরকে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে অহেতুক স্নেহ-প্রীতি এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নরম প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকারক।

এশার নামায পড়া ব্যতিরেকে শিশুদেরকে শুতে দিবেন না। শুয়ে পড়লেও উঠিয়ে নামায পড়ান। ফযরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে ঘুম থেকে জাগান এবং সকালে উঠার অভ্যাস করান। আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط ـ طه : ١٣٢

"নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাযের তাকিদ দাও. এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো।"-সূরা ত্বহা ঃ ১৩২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ

"যখন তার বয়স সাত বছর হয় তখন সন্তানকে নামায পড়ার তাকিদ দাও। যখন তার বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায পড়ার জন্য তার উপর কঠোরতা আরোপ করো এবং এ বয়স হবার সাথে সাথে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"

এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, স্বয়ং আপনি নামাযের পাবন্দ থাকবেন এবং গৃহের পরিবেশ এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে শিশুরাও আগ্রহ সহকারে নামায পড়বে। আপনার কাজ এটাই প্রমাণ করবে যে, নামাযের প্রতি অবহেলা আপনি কোনোক্রমেই বরদাশত করবেন না।

# সন্তানের বিয়ে

শিশু যেই  যৌবনে পদার্পণ করে তখনই সে নতুন ধরনের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং পেরেশানীতে নিপতিত হয়। সন্তান যখন বয়সের এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মাতা-পিতা নতুন ধরনের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। যখন ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন ভয়-ভীতি ও সংশয় তাদের আরামকে নষ্ট করে দেয়। কখনো ভবিষ্যতের সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তায় তাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কখনো অমূলক পেরেশানী এবং কল্পনাপ্রসূত জটিলতায় অন্তর ছোট হয়ে যায়। কখনো দায়িত্বানুভূতি তাদেরকে উত্তেজিত করে এবং অবিলম্বে সন্তানের এ দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে। সুন্দরী ও ভদ্র পুত্রবধু গৃহে আনার আনন্দে তাদের অন্তর কখনো আত্মহারা হয়ে উঠে। কখনো কন্যার জন্য নেকবখত ও নেক চরিত্রের জীবন সাথী পাবার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করে থাকেন।

সন্তানকে বিয়ে দেয়া একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য। তেমনি এটা মাতা-পিতারও আন্তরিক কামনা এবং ইসলামও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও হেদায়াত দিয়ে থাকে।

### ইসলামের হেদায়াত

ইসলাম একটি প্রাকৃতিক ধর্ম। এ ধর্ম প্রকৃতির দান পূরণ করে। সন্তান জওয়ান হতেই যথাযথ সম্পর্ক পাওয়া গেলেই আপনি তার বিয়ে দিতে চান। ইসলাম আপনার এ আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিয়ে থাকে। ইসলামেরও নির্দেশ হলো সন্তান জওয়ান হবার সাথে সাথে তার বিয়ে দেয়ায় বিলম্ব না করা। সঠিক সম্পর্ক পেতে অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন। তবে ইসলামের নির্দেশের আলোকে সঠিক সম্পর্ক পাবার পরও অহেতুক বিলম্ব ও টালবাহানা করা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। অনেক সময় এ অহেতুক বিলম্ব ও টালবাহানা খারাপ ফল হয়। মোটকথা, এ খারাপ ফলের দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতা এড়াতে পারেন না।

### বিলম্বে বিয়ের খারাপ পরিণাম

পুত্র হোক অথবা কন্যা যখনই সে জওয়ান হয়, তখনই তার যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করা মাতা-পিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর যখনই এ ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ের বাকডোরে

বেঁধে দেয়া উচিত। বিয়ের ব্যাপারেত অহেতুক বিলম্ব করা অনেক সময় খুব লজ্জাকর পরিণাম ডেকে আনে। সমাজে মানুষ মুখ দেখানোর যোগ্য থাকে না। এ লজ্জা মাতা-পিতার জীবনে গ্লানিকর হয়ে উঠে। কিন্তু এর দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতার উপরও বর্তায়। কেননা তারা সন্তানের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অলসতা দেখিয়ে থাকে অথবা কোনো শরয়ী ও যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়া বিলম্ব করে। যৌবনের আবেগ বা উত্তেজনা প্রশমনের সঠিক স্থান না পেলে যুবকদের বিপথে পরিচালিত হবার সমূহ আশংকা থাকে। আর এ জন্যে আপনি খারাপ পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করবেন অথবা যুবকদের গালমন্দ দিয়ে নিজেদের অপরাধ হালকা করার নিষ্ফল চেষ্টা চালাবেন তা হতে পারে না। এ রোগের সঠিক চিকিৎসা হলো, আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করুন এবং এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হেদায়াত দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে পালন করুন। বিলম্বে বিয়ের পরিণাম শুধু উদ্ভূত খারাপ পরিস্থিতিই নয়, বরং ইসলামের পরিণাম দৃষ্টিতে আপনি গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَاَدَبَّهُ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ وَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى اَبِيْهِ - بيهقى

"আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো, তার ভালো নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেয়া। বালেগ হবার পর সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং কোনো গুনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"–বায়হাকী

অন্য এক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, "যে ব্যক্তির কন্যার বয়স ১২ বছর হলো এবং সে তার বিয়ে দিলো না এবং সে কোনো খারাপ কাজ করে বসলো তাহলে তার সে খারাপ কাজের শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"

### যোগ্য সম্পর্কের সন্ধান

যোগ্য পাত্র বা পাত্রী না পাবার কারণেই সাধারণত বিয়েতে বিলম্ব ঘটে পুত্র অথবা কন্যার জন্য যোগ্য পাত্রী বা পাত্রের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা

চালানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বরং এ চিন্তা ও চেষ্টা আপনার জন্য ফরয। ইসলামী শিক্ষার দাবীও হলো যে, আপনি যথাযথ সম্পর্কের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবেন।

ইসলাম আপনার নিকট এ দাবী কখনো করে না যে, যত খারাপ পাত্র-পাত্রীই আপনি পান তা চোখ বুজে গ্রহণ করবেন। এ প্রশ্নে আপনি কোনো চেষ্টা অথবা অনুসন্ধান চালাবেন না। বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা জীবনের ব্যাপার। দুনিয়ার ভাঙ্গা-গড়া পর্যন্তই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না বরং পরকালীন জীবনের উপরও তার প্রভাব পড়তে পারে। অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর বিষয়। জীবন সাথী নির্বাচনে চিন্তা-ভাবনা করা অত্যাবশ্যক।

এটা শুধু চিন্তার বিষয় যে, আপনার চেষ্টা-চরিত্র এ চিন্তা ইসলামের আলোকে হচ্ছে কি-না। জীবন সাথী নির্বাচনের যে মাপকাঠি ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই আপনাকে অবলম্বন করতে হবে। নিজের সন্তানের জীবন সাথী নির্বাচনে এসব মৌলক বিষয় সামনে রাখুন। চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন যে, দীনে যেসব বিষয়ে কোনো গুরুত্ব নেই সেসব বিষয়ে প্রাধান্য দিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন।

### জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

জীবন সাথী নির্বাচনে সাধারণত পাঁচটি জিনিস সামনে রাখা হয়ে থাকে।

**এক** ঃ ধন-সম্পদ

**দুই** ঃ বংশ আভিজাত্য

**তিন** ঃ সুশ্রী ও সৌন্দর্য

**চার** ঃ দীন ও আখলাক এবং

**পাঁচ** ঃ শিক্ষা।

এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে, এ পাঁচটি বস্তু স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে ধন-সম্পদের গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারে। বংশ আভিজাত্যও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার বিষয় নয়।

জীবন সঙ্গীনি নির্বাচনে সৌন্দর্য ও সুশ্রী হওয়াটাও মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। তা পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ করে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটিও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহই মানুষকে রুচি এবং সৌন্দর্য প্রদান করেছেন এবং রূপতো পসন্দ করারই বিষয়।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্বীকৃত সত্য। বর্তমান যুগে সম্বন্ধ স্থাপনে, শিক্ষার এবং ডিগ্রীকে তো বিশেষভাবে খেয়ালে রাখা হয়। এটাও ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং সভ্যতায় সুসজ্জিত করে। উচ্চ শিক্ষা মান-ইজ্জত বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সচ্ছল জীবন এবং সমাজে মান-সম্মানের কারণ হয়।

রইলো দীন ও আখলাকের কথা। এটাতো স্পষ্ট ব্যাপার যে, মুসলমানের নিকট তার গুরুত্ব ও মূল্য থাকবেই। প্রস্তাবিত ব্যক্তির মধ্যে মুসলমান মাতা-পিতা সবকিছু দেখবেন অথচ দীন ও আখলাকের ব্যাপারটি উপেক্ষা করবেন অথবা কোনো গুরুত্বই দেবেন না, তা হতে পারে না।

আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা যদি এ হয় যে, আপনার কন্যা অথবা পুত্রকে এমন জীবন সাথী এনে দেবেন যে, এ পাঁচ গুণে গুণান্বিত। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা শুভ। আপনার আশাও ঠিক এবং আপনার প্রচেষ্টাও সঠিক। কোন্ পিতা-মাতা চায় না যে, তার কলিজার টুকরা এসব গুণে গুণান্বিত জীবন সাথী লাভ করুক ?

ইসলাম আপনার এ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেতনার কখনো অবমূল্যায়ন করে না। ইসলাম আপনার এ আবেগের মর্যাদা দেয়।

সকল গুণে বিভূষিত দম্পতি যদি পান তাহলে তা হবে আল্লাহর বিশেষ অবদান। সাধারণত প্রত্যেক সম্পর্ক স্থাপনে সকল গুণ এক সাথে পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। কারোর মধ্যে কিছু গুণ পাওয়া গেলে আবার কিছু মন্দও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আপনার পরীক্ষা হলো, নির্বাচনে আপনাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সামনে রাখতে হবে এবং ইসলাম এ গুণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

### রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হলো, পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচনের সময় সর্বপ্রথম আপনাকে দীন ও আখলাকের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিতে হবে। দীন ও আখলাকের সাথে অন্য চার বস্তুর মধ্যে কোনোটি যদি পেয়ে যান তাহলে আপনাকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। এরপর আর আপনি বিয়েতে অহেতুক বিলম্ব করবেন না। হ্যাঁ, সে আত্মীয়তা অথবা সম্পর্ক আপনার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যে সম্পর্কে সকল গুণই রয়েছে কিন্তু দীন ও আখলাক নেই। মুসলমান

মাতা-পিতার প্রথম দেখার বস্তু হলো দীন ও আখলাক। যার মধ্যে তা নেই অন্যান্য বিষয়ে উদাহরণতুল্য হলেও আপনার কলিজার টুকরার জীবন সাথী হতে পারে না। তাঁকে আপনি ঘরের বধু অথবা জামাই বানানোর চিন্তা করতে পারেন না। অন্যান্য জিনিসের ক্ষতিপূরণ তো দীন এবং আখলাক দিয়ে হতে পারে অথবা এভাবে বলা যায় যে, দীন ও আখলাকের কারণে অন্যান্য দুর্বলতাতো সহ্য করা যায় কিন্তু কোনো বড়ো বড়ো গুণের খাতিরেও দীন ও আখলাকের বঞ্চনা সহ্য করা যায় না। দীন ও আখলাকের ক্ষতি অন্য কোনো গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ ঃ

"বিয়ের জন্য সাধারণত মেয়েদের ব্যাপারে চারটি বিষয় দেখা হয়। সে চারটি বিষয় হলো ঃ ধন-সম্পদ, বংশীয় আভিজাত্য, রূপ ও যৌবন এবং দীন ও আখলাক। তোমরা দীনদার মহিলাকে বিয়ে করো। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।"

এ হাদীস এ নির্দেশই করে যে, আপনি আপনার পুত্রের জন্য এমন বধু আনুন যে দীনদার এবং ইসলামী চরিত্রে সুসজ্জিত। এমন বধুর মাধ্যমেই আপনার গৃহ ইসলামের দুর্গ হতে পারে। আর এমন বধুর থেকেই এ আশা করা যেতে পারে যে, তার কোলেই এ ধরনের সন্তান আসবে, যে দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে হবে মজবুত এবং ইসলামের জন্যে হবে নিবেদিত প্রাণ।

এভাবে জামাই এবং বধু নির্বাচনেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশেও দীন এবং আখলাককেই মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করে যার দীন ও আখলাকের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট এবং খুশী, তাহলে তার সাথে নিজের কলিজার টুকরাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে জমিনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

এ হাদীস আপনাকে সিদ্ধান্তমূলকভাবে নির্দেশ দেয় যে, যখন আপনার নিকট কোনো এমন পাত্রের পয়গাম আসে, যার দীন ও আখলাকের ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট। আপনার নিকট আস্থামূলক তথ্য আছে যে,

পাত্রটি আল্লাহ্ ভীরু, দীনদার, নামায-রোযার পাবন্দ এবং ইসলামী নৈতিকতায় সুসজ্জিত। তাহলে অহেতুক বিলম্ব করা কোনোমতেই ঠিক নয়। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দিন এবং কল্যাণের আশা করুন। কেননা মুসলমানের বিয়ের সম্পর্কের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো দীন ও ঈমান। যে সমাজে দীন ও ঈমানকে উপেক্ষা করে অন্য জিনিসকে গুরুত্ব দেয়া হয় অথবা ধন-সম্পদ ও রূপ-যৌবনকে দীন ও আখলাকের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাহলে এমন সমাজে ফেতনা ও ফাসাদের তুফান সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিই এমন সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

**–ঃ সমাপ্ত ঃ–**

"হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) - কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোজখ।"

(ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

"মুসলিম মহিলা যে নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায়, সে একটি মানুষের জীবনদানকারীর বরাবর সওয়াব পাবে।"

(কানযুল উম্মাল)

"মিরাজের রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করিম (সাঃ) ফরমিয়েছেনঃ কতিপয় মহিলাকে দেখলাম। যাদের বুকের ছাতি সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন্ মহিলা? বলা হলো তারা সেই মহিলা যারা নিজের সন্তানকে নিজের দুধ পান করাতো না।" (তরগীব ও তারহিব)

আধুনিক প্রকাশনী